অন্বেষা

নববর্ষ সংখ্যা

১৪৩০

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ডিজিটাল ষান্মাসিক পত্রিকা

অন্বেষা

নববর্ষ সংকলন

১৪৩০

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ষান্মাসিক ডিজিটাল পত্রিকা

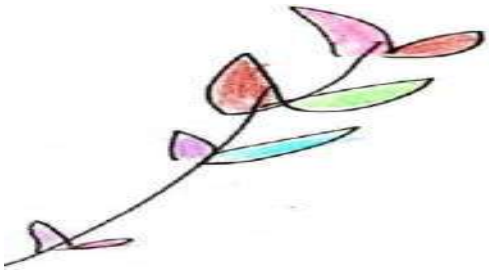

সম্পাদনা

সুধাংশু শেখর পাল
ও
অশোক বিশ্বাস

প্রকাশক

এরিকেয়ার
কেন্দ্রীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদের অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের সংগঠন
সি -৪৩, নিউ গড়িয়া ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেটিভ হাউসিং সোসাইটি,
কলিকাতা - ৭০০০৯৪
Website : http://aricare.in/index.php
Email : aricarekolkata@gmail.com; info@aricare.in
দূরাভাষ : ৯১ ৯৪৩২২০৯৮৫ \ ৯৪৩২০১২৪৬৬

মুদ্রক : মৌসুমী মুখার্জী (৯৮৩০০৮০৮২৪)

সম্পাদকীয়

নূতনের প্রতি আকর্ষণ, উন্মাদনা বা উৎসুকতা মানুষের চিরন্তন প্রবৃত্তি। আর নূতনত্বের প্রেরণায় মানবসভ্যতার ইতিহাসে ঘটেছে অজস্র যুগান্তকারী আবিষ্কার, সমৃদ্ধ কালজয়ী সাহিত্য সম্ভার , কলা , শিল্প, সংগীত ইত্যাদি। দৈনন্দিন জীবনে আছে নানা সংঘাত, সুখ-দুঃখ , হাঁসি - কান্না, প্রেম বিরহ ও আরো কত ঘটনা প্রবাহ। এই ছোট বড় ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে নুতন কিছু পাওয়া একটা বড় ব্যাপার। আমাদের সবার জানা, নুতন একদিন পুরোনো হবে - তবুও নূতনকে পেতে চাই। এর সঙ্গে একাত্ব হতে চাই। একে হৃদয়ভরে উপভোগ করতে চাই। হয়তো এর মধ্যে লুকিয়ে আছে জীবন দর্শন, চাওয়া-পাওয়া আর ইপ্সিত বস্তুকে ভোগ করার অলীক খেলা। মায়ের কোলে নবজাত শিশুকে নিয়ে মা-বাবা, বন্ধু-পরিজন ও প্রতিবেশীদের আনন্দ। স্বহস্তে রচিত বাগিচায় কোন বিশেষ ফল বা ফুল গাছে প্রথম ফুল বা ফল আসা - এক অপরূপ আনন্দ ছুঁয়ে যায় মনকে ! নুতন পরিধেয় বা অলংকার , নুতন জায়গায় বেড়ানো বা অন্য কিছু, নূতনত্বের সাধ, সবই তো মোহময়, মায়াময় - জীবনের এক একটা দৃশ্যপট বা খেলা।

সময়ের গতি নিজস্ব পথে চলে। এক একটা দিন শেষ হয়ে কিভাবে বৎসর শেষ হয়ে যায় বুঝতেই পারা যায়না। কালচক্রে এসে যায় নুতন বৎসর। দিন যায়, ক্ষণ যায় সময় কাহার ও নয়। নববর্ষ তো এই কালসমুদ্রের এক ক্ষণিক লহমা। বাংলা নববর্ষ বাঙালির জীবনে এক ঐতিহ্যময় উৎসব আর এও অনস্বীকার্য যে বাংলা নববর্ষের যে ধ্রুপদী ঐতিহ্য আছে তাকে কি আমরা ক্রমশঃ ভুলে যাচ্ছি ? হ্যাঁ আজও নববর্ষ পালিত হয়, তবে আন্তরিকতার প্রশ্ন বড়ো প্রশ্ন। এক উপচারিকতা মাত্র। রবীন্দ্রনাথ আর বুদ্ধদেবের জন্ম বৈশাখে হবার সুবাদে বাংলা নববর্ষ এক নুতন গুরুত্ব পেয়েছিল। রবীন্দ্র আশ্রিত আধুনিক ভারতের বাংলা সংস্কৃতি এক উচ্চ আঙ্গিকে পৌঁছেছিল, আর তারই সাথে সাথে বাংলা নববর্ষ বরণ। এই দিনটি পালনের নানান আঙ্গিক বাঙালির শিরায় শিরায় প্রবলবেগে বহেছিল বহুকাল। কিন্তু কিছুকাল যাবৎ এই ভাবাবেগে ঘাটতি দেখা যাচ্ছে। সেজন্য অধুনা বাঙালি জনমানসে (বিশেষতঃ নুতন প্রজন্মে) শুনতে পাওয়া যায় - বাংলা নবর্ষ যেন কবে? কৃত্রিমতা যদি কোন সংস্কৃতিকে আবৃত করে ফেলে তাহলে আনন্দটা স্থূল অনুভূতির মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে।

আজ বাংলা ও বাঙালি জাতির জীবনে ঘোর ঘনঘটা। বাঙালি যদি তার স্বতন্ত্রতা ভুলে যায় তাহলে তার সমূহ ক্ষতি। কৃষি উৎসবের অন্তরে বাংলা নববর্ষের যে বীজ নিহিত আছে তা দূরে ঠেলে দিলে বাঙালি, তার নিজস্ব স্বত্বা ভুলে যাবে। অবলুপ্ত হবে বাংলা বৎসরের সঙ্গে জড়িত তার নিজস্ব কৃষি কেন্দ্রিক উৎসবগুলি। পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুপ্রবেশ বাংলা সংস্কৃতির অনেক কিছু গ্রাস করেছে। বর্তমান আর্থ - সামাজিক ও রাজনৈতিক পশ্চাৎপটে আমরা বাঙালি কিভাবে নববর্ষ পালন করবো সেটা ভাবার কথা নয় কি?

" অন্বেষা " র পথ চলা অল্পদিনের মাত্র। কিন্তু এই কম সময়ের মধ্যে "অন্বেষা " ঘরে ও বাহিরে সমাদৃত হয়েছে। বিগত বৎসরের মতো আমরা ও এবার অন্বেষা র নববর্ষ সংকলন প্রকাশ করছি। প্রতিভাবান লেখক ও কবিদের চিন্তন ও মননের বহিঃপ্রকাশ এই সংকলনের মাধ্যমে বৃহত্তর ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পর্বে। এ বিষয়ে আমরা আশাবাদী । যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে এই সংকলনের জন্য লেখন প্রস্তুত করেছেন তাঁদেরকে জানাই অফুরন্ত ধন্যবাদ। আশা করছি ভবিষ্যতে আমরা সকলের সহযোগিতায় উন্নততর সংকলন নিয়ে এগিয়ে চলবো।

কবিতা

মুক্তি সাধন বসু, বংশী মন্ডল, সুধাংশু শেখর পাল, অশোক বিশ্বাস,অশোক কুমার মজুমদার

এবং সুপ্রতীম পাল **৫ – ১৫**

ভ্রমণ কাহিনী

কৃষ্ণ কিশোর শতপথী, বিনয় কুমার সাহা , তনুরুপা কুন্ডু ও দিলীপ কুন্ডু

এবং মধুমিতা দাশ **১৬ – ৫৫**

প্রবন্ধ

উৎপলা পার্থসারথি, দেবাঞ্জন সুর, প্রতাপ মুখোপাধ্যায়, রীনা দত্ত ও মৃন্ময় দত্ত ৫৬ – ৬৮

গল্প

গৌতম রায় **৬৯**

!! কবিতা !!

বিদ্রোহী মন

মুক্তি সাধন বসু

মন বিদ্রোহ করে

যখন তোমাকে দেখি জনসমাবেশে

দাম্ভিকতার শীর্ষে দাঁড়িয়ে উদাত্ব কণ্ঠে বল

গরিবেরা বেঁচে আছে তোমারই করুনায়

তোমারই ভিক্ষার চালে দিনান্তে দুটুকরো রুটিতে

অহংকারের আগুনে পোড়ানো, অনুদানে।

লজ্জায় মুখ ঢাকি

যখন তোমাকে দেখি উচ্ছসিত হতে

অন্নহীন অর্ধমৃত মানুষের মিছিলে জনস্রোতে

অপুষ্টির অন্ধকারে অস্থিসার মানুষের দল

কপালে কালের খাঁজে স্রোতহীন নিস্তরঙ্গ নদী

তারই মাঝে তুমি খোঁজ জয়ের জোয়ার।

আতঙ্কিত চিত্তে জাগি

যখন ঘোষণা শুনি 'খেলা হবে'

প্রকাশ্যে পিশাচিক কোল খালি খেলা

রক্তে হোলিতে গুলিতে গলিতে গালওয়ান

ভোগ দখলের বোঝা পড়া ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে

সাম্রাজ্য বিস্তার সম্পদের একছত্র অধিকার।

বিবেকের যন্ত্রনায় মরি

যখন তকমা দেখি হতশ্রী মানুষের মুখে রূপশ্রীর

কপালে বিজ্ঞপ্তি 'দারিদ্রসীমার নিচে ' পরভোজী

অনুদানে বেঁচে থাকা পালিত জীবের মত

যুগে যুগে শাসকের সংগঠিত লুটের শিকার

পাঁজরের প্রদর্শন ভরা ময়দানে তিলোত্তমা কাঁদে।

প্রত্যাশা

বংশী মন্ডল

অদম্য মেহনতে তিল তিল জমানো।

অহং গর্ব যেন পুঞ্জিত আয়ুর আমানত

বুকে আমার পরমায়ু ঝিনুক কৌটোয় রক্ষিত

কাঙ্খিত ভবিষ্যতের আনন্দ ঘট

এখন আমি ঋতম্ভর হতে চাই জীবন প্রপাতে

উপলক্ষ্য প্রতীক্ষার অবসান নয় - নবীন প্রত্যাশা

ঋষি চোখের দৃষ্টিতে এই আমি

ঐতিহ্যের সংসার , কালের চলমান দলিল

ফুৎকারে উড়িয়ে আয়ুর দায়বদ্ধতা

দেহ বাদের আমানতে বহুদিন বাঁচার আধার

মরেছি অনেকবার , বহু মৃত্যুর পর

পুনর্জন্মে বেঁচেছি বহুবার। বর্তমানে বিরতি

ঈশ্বর বুদ্ধির বিচারে আমি এখন এক ভাসমান যান

কালের তরঙ্গে অতৃপ্ত আহ্লাদ বয়ে বয়ে

শুন্য বোধের পিঠে চড়ে বার্ষিক গতির যাত্রী প্রতীক্ষা উপলক্ষ্য নয় - প্রত্যাশ্যার লালন

ক্ষমা সুন্দর এক আবাসনের অনুসন্ধানে যাত্রা

জীবন্ত অভিজ্ঞতার খোঁজে স্বপ্নের চেয়েও এক সুন্দর আশ্রয়।

সুখের স্বর্গ

বংশী মন্ডল

পরধর্ম মানি না সন্মান দিই সমান

আমি নিষ্ঠুর রূঢ় বাক্যে নাস্তিক

ব্রহ্মা কালের অন্ধকারের উৎসে কতনা আলো

বাস্তবতার পাঁচিলে ঘেরা সেই আমার স্বপ্নদ্যান

কেয়া ফুলের আতরে ম-ম গন্ধে আকাশ ভরা গান

সাদা মেঘের ভেলায় তার প্রতিধ্বনি

জাগতিক ক্রিয়ার এই দেবোদ্যান ই আমার গবেষণা ক্ষেত্র

যেখানে " হ্যাঁ " "না" হয়; না হ্যাঁ হয়

সোনা পাথর হয়, পাথর সোনা হয়

আমি আছি ত্রাস্ত ব্যস্ত ভাবে অভাবে

মরার পাই না সময়, বারে বারে যম ফিরে যায়।

কে বা কী ভাবল

সে ভাবনা আমার নয়

মরণে যাবোনা স্বর্গে ,

অপাপ পুরুষ রেখেছি বুকে

যখন যেখানে থাকি সে বরাভয় আমার সুখের স্বর্গ।

অনন্য বৈশাখ

সুধাংশু শেখর পাল

কি বলে তোমায় করি আবাহন , হে বৈশাখ !

কাল সমুদ্রের নিলাভ - ফেনিল অস্ফুট দ্যোতনা

কি তুমি? অথবা কাল সমুদ্রতটে ভেসে আসা

সময়ের এক ক্ষণিক লহমা ?

তুমি কি আমার বাল্যসখা, নিভৃত আম্রকুঞ্জে ?

লুকোচুরি খেলেছি কতো , রৌদ্র আর ছায়ায়,

আবেশে, আলিঙ্গনে , মোহ আর মায়ায়।

বহু আকাঙ্খিত প্রথম সন্তান তুমি

হও যে বর্ষমাতার ,

কোল এল করে এলে হে বন্ধু,

জুড়ালে সকল ব্যথা।

প্রত্যুষে তুমি কত মনোহর,

নয়নাভিরাম বালকের মতো,

বন্ধু, তপন আর পবনের সাথে,

খেলিলে বালখিল্য যতো।

মধ্যাহ্নে তুমি জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরি,

নিষ্ঠুর, নির্বিকার, চারিদিকে শুধু হাহাকার।

অপরাহ্নে তুমি মদিরাসক্ত যুবা

প্রলাপ বিলাপ করো কি কৃতকর্মের?

সন্ধ্যায় নদীতীরে, বা সমুদ্র সৈকতে।

উন্মুক্ত প্রান্তর কিম্বা শৈলশহরে।

প্রেমে বিহ্বল তুমি হে বৈশাখ।

দেখি যে তোমার রসরাজ রূপে,

আম কাঁঠালের সুবাসে বিমোহিত হয়ে।

বেল, জুঁই , চম্পা , চামেলী

করে প্রহেলি তোমার সাথে,

বাঁধিলে কৃষ্ণচূড়া তোমার সাথে।

তুমি কি বহুরূপী? অথবা লীলাময় !

কাহার ইশারায় করো তুমি লীলা,

কে দেবে উত্তর?

শান্ত সমাহিত তেজস্বী ঋষি ,

অথবা দূর্দান্ত প্রতাপী বিশ্বজয়ী নৃপতি

ভাবিলে অবাক লাগে,

তুমি-ই অনন্য বৈশাখ !

তুমি কি শিব? এক নির্মম সত্য

না অনিন্দ্যসুন্দর, প্রবাদ পুরুষ ?

ঋতু প্রবাহে আসা আর যাওয়া

তুমি এক আত্মা, অবিরাম, অবিনশ্বর!

মন দর্পন

সুধাংশু শেখর পাল

তন্ত্র, মন্ত্র, ষড়যন্ত্র,

এ নিয়ে কি গণতন্ত্র?

মহান দেশের মহান নেতা,

দেখ তার কত কেতা,

বুক ফুলিয়ে করছে কত কাজ,

ইন্দ্রসম দেখায় তার তেজ।

ঘন ঘন আকাশে হানছে কতো বাজ

দেখায় নেতা আরো কত ভেলকি

আম জনতার কি সাধ্যি,

ধরে তার চালাকি?

রাম রাজ্যের আশায় বুক বাঁধে তাহারা,

কি আসে যায় সীমান্তে মরে কাহারা?

মহান নেতা ধরে কতো বুদ্ধি,

আসনে বাসনে করে জীবন যুদ্ধি

ধন্য দেশ, ধন্য গণতন্ত্র

বলবান কি পূজে সর্বত্র?

পাহাড় নিয়ে হচ্ছে খেলা,

বেচবে কলা, বাসায় মেলা,

দুলকি চালে চলছে ভেলা,

নে হরিদাশ এবার ঠেলা?

মাঝ দরিয়ায় উঠলে তুফান

বাঁচবে কি নেতার প্রাণ?

মানো সে একাই একশো,

যখন তখন করে রোড শো।

মা,মা, করে ষষ্টাঙ্গে প্রণাম করে,

বৈতরণী পার হতে গরুর লেজ ধরে।

এক জাতি,এক প্রাণ,

গড়বে ও দেশ মহান।

কালো রঙ থাকবে কি দেশে?

দেখো দেশ যায় বানে ভেসে।

করছে কি ও খাম খেয়ালি?

ওঁনি মোদের রামপেয়ারী।

নূতন করে লেখায় ইতিহাস

বিরোধীরা সব করে হাঁসফাঁস

ট্যাক্স নিয়ে বাক্স ভরে,

বিষ খেয়ে কতো চাষী মরে ।

ভুল করে কাভি না বলে সরি,

নাচে জনতা পেয়ে নেতা আহামরি।

সমঝোতার জীবন

অশোক বিশ্বাস

অলস দুপুরে কিম্বা বৃষ্টি ভেজা পড়ন্ত বিকেলে
স্বপ্ন দেখেছি কত,
হতে চেয়েছি বেদুইন যাযাবর,
হতে চেয়েছি শব্দের কারিগর,
ভেল্কি দেখানো এক যাদুকর
বার বার ভেঙে দিয়েছে সে স্বপ্ন!
ভাঙা চোরা মধ্যবিত্ত, ব্যর্থ জীবন আমার,
কেবলই সমঝোতার।

হইনি দগ্ধ , সইনি কখনও ক্ষুধার দংশন
হাঁটিনি কখনও অন্ধকার বনপথ,
স্বার্থপর – এই জীবন আমার
কেবলই অন্তহীন এক ভীরু সমঝোতার।

তুমি বললে

অশোক মজুমদার

তুমি বললে

আকাশটিকে ধরতে চাও

আমি বললাম

মনের মধ্যে আকাশটিকে বন্দি কর

তুমি বললে

ধানের খেতে হারিয়ে যাব

আমি বললাম

ওরা ধান গাছ কেটে ফেলবে

তুমি বললে

রথের মেলায় যাব

আমি বললাম

বেশ তো পাঁপড় ভাজা খাব

তুমি বললে

একমুঠো বৃষ্টি ধরতে চাও

আমি বললাম

আঁচল ভরে নাও

তুমি বললে

শুকতারার কাছে যাব

আমি বললাম

তারার ভিড়ে হারিয়ে যেও না।

Time and Memory

Supratim Pal

How a year passed away

In my busiest life's way.

A repetition of all sweet memory

of the romantic marriage ceremony.

Does the time move very fast!

Needless to say, to quench my thirst.

fast occurred all the events,

The romantic and colourful moments,

Like tiny waves of momentary existence.

Who thrilled me from distance?

Though busy extremely in profession.

Can I stop all the passions,

How funny would be the repetitions?

!! ভ্রমণ !!

Three Days in Bali Island (Indonesia) and an Encounter with Balinese Hinduism

K K Satpati

Bali is one of the more than 17000 islands in the Indonesian archipelago and is the only Hindu majority province in aoverwhelming Muslim majority country. It is Indonesia's main tourist destination with its spectacular landscape of hills and mountains, coastal beaches, volcanic mountains, lush green rice terraces, gorgeous water falls, coffee and spice plantations, beautiful temple architectures providing tranquility and picturesque views. The island is an abode to an ancient Hindu Buddhist mixed unique culture and traditions. Hinduism arrived in Bali through Indian traders as early as 100 BC. However Balinese Hinduism diverge from mainstream and is quite radically different from what is practiced in India. We, a group of 15 tourists from Kolkata on Indonesia tour reached Denpasar, the capital of Bali by flight from Yogyakarta (Java island) on 1st March,2019 for three days visit there.The place is located at a distance of 900 meters from Equator. Indonesia has 3 time zones and there is one-hour time difference from Jakarta (capitalof Indonesia) and Denpasar.Bali draws approximately 2 lakh Indian visitors each year.

Statues depicting Mahabharata episodes on a busy thorough fare

The Denpasar Airport is an international airport with a heritage architecture with modern amenities inside. The surrounding was quite nice and beautiful. On exit saw our local guide with some ladies with traditional dress called ‘Kabey’, who garlanded us. This is probably is tradition of welcoming tourists as we saw some other tourists were also being garlanded. The local guide (male) was also in traditional dress wearing ‘Sarong’, a length of fabric with decorative border rapped around the waist. The head dress is called ‘Udeng’ made of a square cloth that isintricately tied around the head to form a knot in the middle. As soon as we came out of the airport we got good visual of Mahabharat war. There is a big Ghatotkacha Karna war statues in front of airport. The statue is called Patang Ghatokaja(meaning statue of warrior Ghatotkacha). While Indians hardly recognize Ghatotkacha, Balinese people admire and respect him as a real hero even though he was defeated by Karna possessing divine weapons.

The cast figure of ‘Vishnu’ near a jewelry shop

We boarded a waiting bus for the hotel and on the way, the guide started giving some preliminary introduction about Bali island. Bali is a small island having an area of 5600 km^2 with length145 km from east to west and 90 km from north to south. The population of the island is 3 million, however, four times that number i.e. 12 million tourists come here every year. Now lot of tourists come from Europe. 90% of the population of Bali island are Hindus. There are thousands of temples and always some kind of festival and ceremony. Java and Bali islands of

Indonesiaare highly populated although Borneo is the biggest island of which 80% belong to Indonesia and the rest is divided into two parts – one is with Malesia and other is an independent country. There are two active volcanos in the island now. Japan occupied the Bali island in world war II. The guide informed that there is only 10% people below poverty level in Bali. Stealing is almost nil. He said tourism flourished Bali since 2000;before that people were mostly depending on agriculture especially paddy cultivation and were poor.

Our guide in Balinese traditional dress

We started from the hotel for the island tour next morning. The local guide was quite tour friendly. Everyday he was handing over some refreshment packets, fruit juices, and wherever necessary raincoats, umbrella etc. Denpasar city is quite nice and clean though roads are rather narrow.There are lot of motorcycles on the road; houses are mostly 2-3 stories. Lot of south Indians are seen everywhere.On the roads, there are symbols oh Hinduism all over. There are statues of Krishna, Karna, Bhima as well as big sculptures describing episodes of Ramayana and Mahabharata. Recently they have constructed 12 km road over sea connecting two islands – and there is a statue of 'Garuda' which is higher than the statue of liberty. The first stop was a big jewelry shop (mostly silver) with a huge display hall. Many young people were seen working there. Jewelries also have the stamp of Hindu tradition. However hardly anybody from our group purchased anything from the shop. The value of Indonesian currency (Rupiah) is very low. One

Dollar is equivalent to 15000 (approx.) Indonesian Rupiah. So, a small thing costs in thousands and even lakhs of Rupiah.

Ritual bathing with holy spring water at Tirtempul temple

The second spot of visit was the 12th century Tirtempul temple dedicated to Vishnu, where there was a large gathering of pilgrims for some water purification ceremony. The temple has large rectangular pool with quite a few springs which Balinese Hindus consider to be holy or amrita. People were seen taking ritual bathing there which is believed to wash away their sin, wards off evil and purifies their soul. We had put on customary (compulsory) cloth to cover the lower portion for entering the temple.Next, we proceeded to see the live volcano from a mountain some distance away. We travelled on a totally rural road. The villages were mostly appeared like our mufassil towns even though the roads were narrow. There were good greeneries with paddy fields, coconut and other trees. We started going uphill and temperature was cool; we had to put on sweater. Finally, we reached the foothill of Mount Agung, the highest mountain in Bali. However, there was no volcanic activity at present but had good view of the summit (3142 metermsl) from a restaurant where we had our lunch. In 1963, the volcano erupted after being dormant for 120 years killing 1600 people. Many adventure seekers especially Europeans hike Mount Agung to experience the gorgeous sun rise as well as volcanic activity there. There is also a volcanic crater lake nearby.

Inside the Tirtempul temple

It does not take much time on the island to notice that Hindu temples are literally everywhere. There are thousands of temples (more than 20000, according to an estimate) across the island. Every village has at least three major temples with some kind of community religious activity always going on. Further, every house has family temple complex in their compound looking to the mountains. Each temple space of worship has at least three prominent deities – Brahma, Vishnu and Shiva. Along with the trinity, Balinese Hindus worship a range of Gods and Goddesses like Ganesh, Garuda as well as host of others not found in Indian Hinduism. Baisakhi and Shivaratri are observed in a big way. We could see bamboo poles decorated with young coconut leaf, flower, colored cloths in front of almost every house. It is supposed to be symbol of triumph of good over evil. The guide said caste system prevails in Bali. There are four castes:Brahmin, Kshatriya, Vaishya and Sudra. Inter caste marriage is prohibited. The guide narrated his story. He belongs to the lower caste but married an upper caste brahmin girl of his office. But his wife's parents kidnapped her and he had lot of problems. During the religious ceremonies and social events higher caste people are given more respect and special consideration.

Mount Agung with dormant volcano

On 7th March there will be ‘Nyepi’ the Balinese new year day according to Balinese saka calendar. On the road there were huge colorful processions seen with village people wearing white cloths from different temples with parasols, banners, and ‘puja’ materials as well as smalleffigies on head proceeding towards the sea beach for some purification ceremonies. ‘Nyepi’ is observed in Bali as a Day of Silence, fasting, meditation and self-reflection. The restrictions on the day are: no lighting of fires, no working, no entertainment or pleasure, turning off all lights (or low light) as well as sound and for some no talking and eating at all on the day. On ‘Nyepi’ day, most of the people remains silent deserting all worldly activities and all transport on the road including the airport and sea port remains shut down; complete silence and serenity reigns over entire island. According to the guide, the cremation ceremony (called ‘Ngaben’) which is also an elaborate community-based expensive ritual which may cost up to 100 million IDR; as a result, some people has to bury their dead bodies at least temporarily. Once the funds are arranged, families will choose an auspicious day to carry the dead bodies for cremation. There is also mass ‘Ngaben’ ceremonies; many families collectively share the cost of the ritual cremation.

Balinese new year procession during 'Nyepi'

We visited Tegenun water fall and experienced famous agritourism of Bali. We had to go150 step below to go close to the water fall. The waterfall foams in a white cascade of 66 feet high on black stone cliffs into quite pool. There are some bathing areas for visitors. There are beautiful views of rice terraces around, which is a tourist icon in Bali; many tourists visit the site-paddy terraces - every day.

Coffee and other diverse plantations as a destination of agritourism

We all had a plantation tour of coffee garden providing us an enchanting view and educational experience learning about how coffee beans are produced and processed until it is made into a cup of coffee. Coffee is planted along with other tropical plantations such as pine apple, snake fruit, Balinese potatoes and various fruit as well as spices. The gardens sell various coffee products, spices herbal oils etc. We were offered coffee, lemon grass extract and other juices. The most interesting feature is the processing of the costliest coffee called 'civet coffee' which is produced from partially digested coffee cherries which have been eaten by a mongoose like creature: Asian palm civet (*Paradoxurus Hermaphroditus*). The cherries are fermented as they pass through intestines and following defecation the faecal matter is collected and processed producing the most expensive coffee.

Asian palm civet from whose faecal matter expensive coffee is produced

We reached the town of Ubud which is known as a center for traditional craft and dance. We visited theart village which is recognized as center for Balinese art viz. weaving, wood curving and painting etc.We firstwalked up to a wood carving factory. Villagers here are expert in wood carving famous across the world. We could witness artists creating beautiful wooden pieces with motifs taken from Hindu and Buddhist mythology. We then similarly passed by a stone carving village. We stopped at one of the painting shops and observed high standard painting meant for export. Finally, we entered Batubulan village famous for traditional Kecak dance. Kecak is one of the Balinese artistic master pieces in the form of a dance and musical performance. We attended one dance performance based on episodes from Ramayana. It was held in the open, below a shed without any backdrop at sunset and continued to night when only light came from bamboo torches. There were also no musical instruments. We saw a group 20-30 bare chested men wearing traditional 'sarong' sometime sitting cross legged, sometime dancing and gesticulating and shouting in different voices around the stage. We could vaguely understandthat the dancers are playingcharacters such as Rama,Ravana, Hanuman, Sita

etc.rendering the episodes from epic Ramayana.Kecak dance is regularly performed in many places all over the Bali island.We returned to the hotel after the dance performance.

Traditional Kecak dance based on Ramayana story

Early next morning we started for the most popular Kuta beach nearby our hotel. It is long stretch of sandy beach with big waves reputedly a surfer's paradise. This is the place where the tourism in Bali all started. There are large number of beach bars, restaurants, hotels and night clubs. We could see thousands of tourists swimming, surfing, sunbathing on the beaches or spending quite time under colored umbrella. The guide saidAustralians come here mostly for enjoying night life. British and other Europeans go to mountains and villages to spend time there.

Kuta beach

We started our journey to visit Ulundanuberatan temple along a hilly road, some 55 km away. The journey was through beautiful landscape with greeneries and paddy fields. The area is famous for vegetables, spice and strawberry farming.Reached the temple site after about one and half hour'sjourney. PuraUlun Danu is a major Shaivite temple complex located on the shores of lake Beratan which sits on a volcano crater. It is most popular for its historical relevance as well as the Balinese architecture and picturesque location in the mountain. The temple complex has four sacred structures devoted to The Hindu Gods – Brahma, Vishnu, Shiva as well as the goddess of the lake. This 12-tiertemple was built by the Balinese king Mengwi in 17th century. However, there were no signs of any 'puja'. One of temples was locate inside the lake where priest goes for puja with the help of Bamboo.

Ulundanuberatan temple

We had returned journey on the same route and after one and half hour journey reached 16th century Tanah lot temple a highly reveredreligious place beside the sea. The place is packed with lot of visitors and sellers. Tanah lot is an ancient Hindu temple dedicated to the Gods of the sea. The temple is located on offshore rock formation near the coast of Indian ocean. We had to walk a lot through petty shops and hawkers to reach the temple. The temple is dedicated to the sea god. Along with the temple, large people have gathered here to watch large Indian ocean waves crashing on the rocks during high tide and see the sunset over the Indian ocean. After the sunset we observed the mass exit of people from the area and the roads are clogged; there was a huge traffic jam for about two hours or so. It appears people did not allow construction of flyover as vehicle can not move over a religious procession below the flyover.

Indian ocean coast beside Tanah lot temple

The Bali tour was concluded last evening. However, the good feeling of the toured was marred while checking out of the hotel, the hotel manager imposed a fine 2,30,000 IDR on one lady of our group for allegedly damaging the room table which she denied. However, the matter could be settled through negotiation without paying fine. The guide bid us goodbye at the airport thanking us for backing tourism in Bali. The flight was in time and we reached Kolkata with one stopover in Kualalampur as scheduled.

একটি ভ্রমণ কাহিনী - মুর্শিদাবাদ ভ্রমণ

বিনয় কুমার সাহা

ছোটবেলায় ইতিহাস বইতে পড়া বাংলার ইতিহাসের কথা বলতে গেলে সবচেয়ে বেশী করে কোন জায়গাটার কথা মনে পড়ে ? (আমার এই প্রশ্নের উত্তর "মুর্শিদাবাদ" ই হবে যেহেতু এই লেখা "মুর্শিদাবাদ ভ্রমণ " সম্পর্কে। তা নাহলে গৌড়, নদীয়া, বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর - এসবও হতে পারত।) হ্যাঁ , মুর্শিদাবাদ। মুর্শিদকুলি খাঁ থেকে শুরু করে নবাব সিরাজ-উদ - দৌলা পর্যন্ত বাংলার নবাবদের স্মৃতি যেখানে জড়িয়ে আছে, তাঁদের ব্যবহৃত সরঞ্জাম আর জীবনযাপনের ইতিহাস যেখানে ছড়িয়ে আছে - সেই মুর্শিদাবাদ। ইতিহাস যেখানে জীবন্ত হয়ে মানুষের সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার মতো চলতে থাকে - সেই মুর্শিদাবাদ।

বহুবছর ধরে চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত ১০ই ফেব্রুয়ারি , ২০২৩ সকাল ৬.৫০ এ কলকাতা স্টেশন থেকে হাজারদুয়ারি এক্সপ্রেস এ আমরা মুর্শিদাবাদের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। এবারে আমাদের দল ছয়জনের - আমি, আমার স্ত্রী (বেবিকা) , ছেলে (তনয়), বৌমা(পৌষালি), বৌমার মা (নুপুর) ও আমার নাতি (কিয়ান) । আমাদের হোটেল যেহেতু বহরমপুরে , আমরা বহরমপুর পৌঁছোলাম সকাল ১০.৩০টায়।

স্টেশন থেকে আমাদের 'হোটেল নন্দিতা' প্রায় দু'কিলোমিটার দূরে, হোটেল থেকে আমাদের রিসিভ করার জন্য হোন্ডা এমেজ পাঠিয়ে ছিল। এটা অবশ্য হোটেলের নিয়মের মধ্যে পড়ে।

ডিসেম্বর - ফেব্রুয়ারি হচ্ছে মুর্শিদাবাদের যাকে বলে 'পিক সিজন 'কাজেই আগে থেকে বুক না করে এলে ঘর পাওয়া প্রায় অসম্ভব, অন্ততঃ নন্দিতার মতো হোটেলে এবং পুরোটাই সেন্ট্রালি এসি। আমরা পাঁচ তলায় দুটি ঘর নিয়েছিলাম যার ভাড়া ২৫০০ - ৩০০০ টাকা / প্রতিদিন। আমরা দুপুরে হোটেলেই খেয়ে নিলাম। এখানে প্লেট সিস্টেমে - ভাত ডাল ভাজা তরকারি আর সেইসঙ্গে মাছ বা মাংস। আমাদের দুই চিনে পড়ল মোট ৩৫০০ টাকা।

এরপর আমরা হোটেলে ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলে একটা স্করপিও ঠিক করে নিলাম আমরা কবে কোথায় ঘুরবো। আমরা ফিরে যাবো ১২ই ফেব্রুয়ারি ভোরের ট্রেন ভাগীরথী এক্সপ্রেসে , তাই আমাদের হাতে আজ বিকেল আর কাল সারাদিন। তাই আর দেরি না করে আমরা সবাই ফ্রেস হয়ে দুপুরের খাবার সেরে বেরিয়ে পড়লাম কিরীটেশ্বরী মন্দির দর্শনে , কিরীটেশ্বরী মন্দির হল হিন্দুধর্মের শাক্ত মতের পবিত্র তীর্থ শক্তিপীঠগুলির অন্যতম। এটি রা বাংলার প্রাচীন পীঠস্থান গুলির মধ্যে কিরীটকনা অন্যতম,যদিও বর্তমান মন্দিরটি বেশি পুরোনো নয়। এই মন্দিরের নিকটে একাধিক মন্দির আছে। তান্ত্রিকমতে, এখানে দেবী দাক্ষায়ণী সতীর 'কিরীট' অর্থাৎ মুকুটের কণা পতিত হয়েছিল। যেহেতু এখানে দেবীর কোনও অঙ্গ পতিত হয়নি , তাই এই স্থানকে অনেক তন্ত্রবিদ 'পূর্ণ পীঠস্থান ' না বলে 'উপপীঠ ' বলে থাকেন। এই পিঠে দেবী 'বিমলা'এবং তার ভৈরব 'সম্বর্ত ' নাম পূজিত হন।

মাতা কিরীটেশ্বরী

এরপর আমরা শ্রী শ্রী জগদ্বন্ধু ধাম আশ্রমে কিছুটা সময় কাটালাম। এই জায়গার কোনও ঐতিহাসিক গুরুত্ব নেই, এখানে জগদ্বন্ধুর জন্ম হয়েছিল। এখানকার মন্দিরটা দেখতে খুব সুন্দর - যেটা সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে সেটা হল মন্দিরের গায়ে-মাথায় খোল আর করতাল এর ছবি আর মডেল। মন্দিরের লাগোয়া নাটমন্দিরটা বেশ বড় আর পরিস্কার।

আমাদের পরের গন্তব্য স্থান হল 'খোসবাগ ' - সিরাজ -উদ -দৌলার সমাধি। এখানে সিরাজ ছাড়াও তাঁর পত্নী লুৎ ফান্নিসা , দাদু আলীবর্দী খাঁ এবং তাঁদের পরিবারের অনেকের সমাধি রয়েছে। এখানে প্রায় ৩৬ জনের সমাধি আছে তবে কোনটা কার সমাধি নিজে থেকে জানার উপায় নেই কারণ সমাধির ওপরে আরবিতে লেখা। শুধুমাত্র সিরাজ এর সমাধিটাই কিনতে পৰ যায় এর কেন্দ্রিয় অবস্থান দেখে। সমাধি ছাড়াও এখানে রয়েছে খোসবাগ মসজিদ যেটা নবাব আলীবর্দী খাঁ তৈরী করিয়েছিলেন। জায়গাটা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং ভালোভাবে রক্ষণাবেক্ষন করা হয়।

এরপর আমরা চলে এলাম কাশিমবাজার রাজবাড়ী তখন প্রায় ছটা তাই আর রাজবাড়ীতে প্রবেশ করা হল না কেননা প্রবেশের সময়সূচি সকাল ১০.০০ - ৫.০০

সুতরাং আমাদের গাড়ির চালককে অনুরোধ করলাম আগামীকাল প্রথমেই কাশিমবাজার রাজবাড়ী দেখে তারপর হাজারদুয়ারি যাবো।

পরের গন্তব্য হল পাতালেশ্বর মন্দির। এখানে নাকি শিবরাত্রি পুজোর দিন হাজারো ভক্তের সমাগম হয়। আমাদের প্রথমদিনের ঘোরা শেষ - রাত আটটা বাজে। হোটেলে ফিরে রাতের খাবার খেয়ে যে যার ঘরে চলে গেলাম।

১১ই ফেব্রুয়ারি , ২০২৩, সকালে ব্রেকফাস্ট করেই বেরিয়ে পড়লাম কাশিম বাজার রায় পরিবারের রাজবাড়ীর উদ্দেশ্যে। এখানে প্রবেশ মূল্য ৫০০ টাকা তাই টিকিট কেটে ভিতরে প্রবেশ করে দেখার সাথে সাথে প্রচুর ছবি তুললাম। রায় পরিবারের

কাশিমবাজার রাজবাড়ী ইউরোপীয় এবং ভারতীয় স্থাপত্যের একটি দুর্দান্ত উদাহরণ, এখন প্রেমের সাথে তার পূর্বের গৌরব পুনরুত্থিত। এখন সুগার ও স্পাইস এর মালিক তাছাড়া এখানে থাকার ব্যবস্থা ও আছে। ইচ্ছে হলে অনলাইনে বুক করেও যেতে পারেন।

আমাদের পরের গন্তব্য স্থান হলো হাজারদুয়ারি। হাজারদুয়ারি খোলে সকাল ন'টায়। হাজারদুয়ারিতে ঢোকার টিকিট ২৫ টাকা করে। ভেতরে কোনও ক্যামেরা এমনকি মোবাইল ক্যামেরাও নিয়ে যাওয়ার নিয়ম নেই আর লুকিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেও লাভ নেই।

হাজারদুয়ারির সঙ্গে কিন্তু সিরিজ--উদ-দৌলার কোনো সম্পর্ক নেই। সিরাজের মৃত্যুর অনেক পর হাজারদুয়ারি তৈরি করা হয়। হাজারদুয়ারীর সঙ্গে কলকাতার টাউনহলের আকৃতির সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় - কারণ দুটোই একই কোম্পানির ডিজাইন করা। আমরা হাজারদুয়ারির ভিতরে ঢুকলাম। হাজারদুয়ারিতে এক হাজারের মতো দরজা আছে , সেই থেকেই এই নাম , দরজাগুলির মধ্যে কিছু আসল আর কিছু নকল -এসব মোটামুটি সবাই জানে। কিন্তু যেটা নিয়ে মতানৈক্য শুনেছি সেটা হল কতগুলো আসল আর কতগুলো নকল। বিভিন্ন জায়গা থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে লিখছি ১০০ নকল আর ৯০০

আসল। এই নকল দরজাগুলো চট করে দেখে বোঝা যায় না , তবে কাছে গিয়ে নিরীক্ষণ করলে ধরতে পারা যায়। জানলাম ইঁট চুন সুরকির সঙ্গে খয়ের জল , আখের গুড় , ডিমের কুসুম ইত্যাদি ব্যবহার করে এই দরজা তৈরি হয়েছিল। (খুবই সুস্বাদু দরজা, তাতে আর সন্দেহ কি !) হাজারদুয়ারির ভেতরে আরেকটা আকর্ষনীয় জিনিস হল সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার উপহার দেওয়া ১০১ বাতির একটা সুদৃশ্য ঝাড় লন্ঠন। এছাড়া হাজারদুয়ারির ভেতরে রয়েছে নওয়াব আর ইংরেজদের ব্যবহৃত বহু অস্ত্রশস্ত্র , জিনিসপত্র , বাসনপত্র , আসবাবপত্র , শুধু পত্র , বহু বিখ্যাত শিল্পীদের হাতে আঁকা ছবি ,, বিলিয়ার্ড বোর্ড , পলাশীর যুদ্ধে ব্যবহৃত সরঞ্জাম ইত্যাদি। হাজারদুয়ারি ভালোভাবে দেখতে গেলে কমপক্ষে দু-আড়াই ঘন্টা সময় নিয়ে যাওয়া উচিত। হাজারদুয়ারি শুক্রবার বন্ধ থাকে।

হাজারদুয়ারির ঠিক মুখোমুখি রয়েছে ইমামবাড়া - এটা বাংলার সবচেয়ে বড়ো ইমামবাড়া . এটা বছরের মধ্যে শুধুমাত্র মহরমের সময়ে ১০দিন খোলা থাকে ,বাকি সারাবছর বন্ধ থাকে। হাজারদুয়ারি থেকে যখন বেরোলাম তখন ঠিক বেলা বারোটা।

পরের গন্তব্য নসিপুর রাজবাড়ী। এর বৈশিষ্ট্য হল এটা হাজারদুয়ারীর আদলে তৈরি করা। নসিপুর প্রাসাদ ছিল দেবী সিংহের দরবার , যিনি নবাবী আমলে ব্রিটিশদের ব্যয় আদায়কারী ছিলেন এবং কঠোর কর কর্তৃপক্ষ হিসাবে খ্যাত ছিলেন। নসিপুর

রাজবাড়ির ব্যাক্তিগত জিনিসপত্র, ফরম্যান্স , সেই সময়ের কর আদায়ের সাথে সম্পর্কিত আইনী দলিল এবং অন্যান্য বিষয়াদি প্রদর্শন করে এটিকে নসিপুর রাজবাড়ি যাদুঘরে রূপান্তর করা হয়েছে।

এরপর চতুর্থ গন্তব্য - জগৎ শেঠের বাড়ি। জগৎ শেঠের বাড়িতে প্রবেশ মূল্য মাথাপিছু ২০ টাকা। জগৎ শেঠের বাড়িও কিছুটা দুগারদের মতোই - পার্থক্য হলো জগৎ শেঠ হলেন একজন যিনি সিরাজের সঙ্গে বিস্বাসঘাতকতা করেছিলেন। ইনি একজন ধনকুবের ছিলেন - সেটা ওনার বাড়ির নানারকম সরঞ্জাম থেকেই বোঝা যায়। এখানে মাটির নিচে একটা মিউজিয়াম আছে। এই মিউজিয়াম এ বাংলার বিখ্যাত মসলিন দেখতে পাওয়া যায়। এই মসলিন নাকি এতই নরম যে একে আংটির ভেতর দিয়ে চালান করা যায়। সেটা প্রমান করার জন্য ই এখানে একটা মসলিনকে তিনটে আংটির ভেতর দিয়ে চালান করে দেখানো আছে। বাড়ির সঙ্গে একটা মন্দির আছে।

পঞ্চম গন্তব্য -- কাঠগোলা বাগান। কাঠগোলা বাগানের মধ্যে আসলে রয়েছে দুগার পরিবারের বাড়ি। সম্ভবতঃ রাজস্থান নিবাসী এই দুগার পরিবার অত্যন্ত ধনী ছিলেন এবং এই বাড়িতে তাঁদের ব্যবহৃত সামগ্রী এবং আসবাবপত্র রয়েছে। এই দুগার পরিবারের বংশধর আজও জীবিত আছেন এবং কলকাতায় থাকেন। নিজেদের এই আদিবাড়ি আর সংগ্রহশালাকে সাধারনের উদ্দেশ্যে খুলে দিয়েছেন মাথাপিছু ১৫টাকা প্রবেশমূল্যের বিনিময়ে। এই হচ্ছে মাড়োয়ারী বুদ্ধি। দুগারদের বাড়িতে বেশ কিছু দেখার জিনিস থাকলেও খুব আগ্রহজনক কিছু নয় বরং বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে ফুলের বাগানটা খুব সুন্দর। তাছাড়া আছে একটা জৈন মন্দির যার দেওয়ালে নানারকম ভাস্কর্য্য দেখা যায়। একটা কথা বলতে পারি , সবকিছুর পরে দুগারদের বাড়ি বা কাঠগোলা বাগানের সঙ্গে ইতিহাসের কোনও সম্পর্ক নেই। এখানেই ' এক যে ছিল রাজা ' ছবির শুটিং হয়েছিল।

এরপর ষষ্ঠ গন্তব্য - মতিঝিল। মতিঝিল তৈরি করান নবাব আলীবর্দীর জামাই। এখানে একটা অশ্বখুরাকৃতি হ্রদ আছে যেখানে একসময়ে মোতি বা মুক্তোর চাষ হতো। এখানে একটা মসজিদ আছে। সেগুলোর ইতিহাসের ডিটেলে আর যাচ্ছি না, শুধু একটা ইন্টারেষ্টিং গল্প বলছি। মতিঝিলের মসজিদের পাশে একটা ঘর আছে যার কোনও দরজা বা জানালা নেই। চারিদিকে দেওয়াল আর ছাদ টাও ঢাকা। কথিত আছে সিরাজ এক ফৈজির ওপর রেগে গিয়ে তাঁকে মাঝখানে রেখে এই ঘর তৈরি করান। অনেকে মনে করতেন এইঘরে অনেক মণিমুক্তো আছে। কিন্তু এর আশ্চর্য শক্ত ইঁটের গাঁথনি কেউ কোনোভাবে ভাঙতে পারেনি। পরবর্তীকালেও কোনও একজন সাহেব এইঘরের দেওয়াল কামানের গোলা দিয়ে ভাঙার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন এবং সেইদিন রাতেই সাহেব মারা যান। তারপর থেকে এইঘরের দেওয়াল ভাঙার আর কেউ চেষ্টা করেননি। দেওয়ালে কামানের আঘাতের চিহ্ন আজও স্পষ্ট দেখা যায়।

রাত আটটা। এবার হোটেল এ ফেরার পালা। পরের দিন সকাল ছয়টা তিরিশ ভাগীরথী এক্সপ্রেস। যথারীতি হোটেল থেকে একটা গাড়ি আমাদের বহরমপুর স্টেশনে পৌঁছে দিল। সকাল সাড়ে এগারোটায় আমরা একটা সুন্দর স্মৃতি নিয়ে বাড়ি পৌঁছলাম।

ঘুরে এলাম ঝাড়খন্ড : গালুডি

তনুরূপা কুন্ডু ও দিলীপ কুন্ডু

গত সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে হঠাৎ করে দুই বন্ধুর পরিবার মিলে ঠিক করলাম দু'দিনের জন্য আমরা একটু 'অফ বিট' কোনো জায়গায় বেড়াতে যাবো। মনস্থ করা হলো কলকাতা থেকে মাত্র ২২৫কিমি দূরে ছোট ছোট টিলা ও পাহাড়ে ঘেরা ঘাটশিলা শহরের কাছে অবস্থিত একটা ছোট্ট জনপদ 'গালুডি।'আগেকার দিনে গালুডিতে লোকজন যেত জলহাওয়া পরিবর্তন ও স্বাস্থ্যোদ্ধার করার জন্য। আমরা অবশ্য যায় আড়াই দিনের জন্য বেড়াতে। তাই নির্দিষ্ট দিনে হাওড়া- বারবিল -জনশতাব্দী এক্সপ্রেসে চড়ে বসলাম ভোর ৬.২০তে। ট্রেনটা হাওড়া পেরোতেই দেখলাম ভরা বর্ষায় প্রকৃতি যেন চারিদিকক সবুজ কার্পেটে মুড়ে দিয়েছে। মাঝে মধ্যে নিম্নচাপের বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিও হচ্ছিল। আমাদের ট্রেন সকল ৯.১০এর মধ্যে পৌঁছে গেল ঘাটশিলায়। স্টেশন চত্বরে আগে থেকে বলে রাখা গাড়ি অপেক্ষা করছিল আমাদের জন্যে। আমরা এখন যাবো ঘাটশিলা স্টেশন থেকে মাত্র ১০কিমি দূরে 'গালুডির ' একটা গেস্ট হাউসে। মিনিট কুড়ি পঁচিশের মধ্যে পৌঁছে গেলাম 'রজনীগন্ধা' গেস্ট হাউসে।মরচে ধরা একটা বিশাল গেটের ওপরে অস্পষ্ট ভাবে লেখা ' রজনীগন্ধা গেস্ট হাউস '. গেটের ওপারে ছোট একটা টিলার মাথায় অবস্থিত গেস্ট হাউসটা। আমরা পৌঁছতেই গেস্ট হাউসের কর্মচারীরা এসে আমাদের বাক্স , তোরঙ্গ সব ওপরে তুলে দিল। আমরা একটু কষ্ট করে অসমান ও খাঁড়া সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠলাম। হাঁপিয়ে গেছি এতটা উঠতে। তাই সেখানেই পাতা চেয়ার এ বসে পড়লাম একটু বিশ্রামের জন্যে। চেয়ার এ বসতেই দেখি একি অপরূপ দৃশ্য !চারিদিকে পাহাড় আর পাহাড়। আর কি সুন্দর বর্ষার মেঘেরা পাহাড়ের মাথা ছুঁয়ে খেলা করে চলেছে। এবার নিচের দিকে তাকাতেই দেখলাম রকমারি গাছ গাছালিতে ভরা গেস্ট হাউস চত্বরটা। বাতাবি লেবু গাছে বড়ো বড়ো লেবু ঝুলছে। কয়েকটা চন্দ্রপ্রভা গাছ টিলার মাথা পর্য্যন্ত এসে গেস্ট হাউসকে হলুদ ফুলে সাজিয়ে রেখেছে। জবা গাছগুলো ফুলে ফুলে ছেয়ে রয়েছে। এবার রুমে ঢুকে ফ্রেশ হয়ে প্রাতরাশ করার পালা। অনেক ছবি ক্যামেরা বন্দি করতে হবে এই ভেবে ঘরে ঢুকলাম ফ্রেশ হতে। এরপর ব্রেড ওমলেট সহকারে প্রাতরাশ সেরে আমরা বেরিয়ে পড়লাম আশপাশটা দেখতে।

নাতি দূরেই ছোট গালুডি স্টেশন। সারাদিনে মাত্র দু'একটা প্যাসেঞ্জার ট্রেন ছাড়া এই স্টেশন দিয়ে শুধু মালগাড়ির আনাগোনা। গালুডি শহর এবং রেলস্টেশন চত্বর বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এখানে প্রয়োজনীয় সব জিনিসই পাওয়া যায়। আমরা ঘন্টাখানেক হেঁটে শহরের কিছুটা দেখে নিলাম। এবার গেস্ট হাউসে ফিরে লাঞ্চ সেরেই বেরোতে হবে সিদ্ধেশ্বর পাহাড়, সুবর্ণরেখা নদীরওপরে গালুডি ড্যাম, রুক্মিণীদেবীর মন্দির এবং জাদুগোড়া ইউরোনিয়াম খনি দেখতে। সময়মতো গেস্ট হাউসের নিচে এসে গাড়ি উপস্থিত।

আমরা বেরিয়ে পড়লাম আমাদের আজকের দর্শনীয় স্থানগুলোর উদ্দেশ্যে।

কিছুদূর যাওয়ার পর আমাদের গাড়ি গালুডি ড্যাম অতিক্রম করলো। ফেরার পথে ড্যাম থেকে সূর্যাস্ত দেখবো বলে সিদ্ধেশ্বর পাহাড়ের উদ্দেশ্যে গাড়ি ছুটল। সিদ্ধেশ্বর পাহাড়ের ওপর থেকে সুবর্ণরেখা নদীপথের দৃশ্য বেশ সুন্দর দেখা যায়। বেশ কিছুটা পাহাড়ের উচ্চতা পর্যন্ত গাড়িতে ড্রাইভার আমাদের উঠিয়ে দিয়ে বলল এবার পায়ে হেঁটে উঠতে হবে। পাহাড় ঘন সবুজ অরণ্যে ঢাকা। বর্ষার জলে আরো ঘন ও চকচকে পাতায় অরণ্যের সভা বাড়িয়ে দিয়েছে। ঘন সবুজের মাঝখান দিয়ে চলে গেছে চড়াই পাথুরে পথ। আমাদের বয়স্ক মানুষের পক্ষে সেই চড়াই পথ অতিক্রম করে পাহাড়ের মাথা পর্যন্ত ওঠা দুঃসাধ্য ছিল। তাই কিছুটা ওপরে উঠে অরণ্যের শোভা দেখেই খুশি হয়ে নিচে নেমে এলাম।

এরপর আমরা গেলাম কাছেই জাদুগোড়া পাহাড়ের ওপরে অবস্থিত রুক্মিণীদেবীর মন্দির দর্শনে। রুক্মিনী দেবী মা কালির এক অবতার। প্রধানত পূর্ব ভারতের উপজাতি দ্বারা উনি পূজিত হন। শুধুমাত্র ভূমিজ উপজাতিই এই মন্দিরের পূজারী হতে পারেন। জনশ্রুতি অনুযায়ী প্রাচীনকালে এখানে নরবলির প্রচলন ছিল যা ব্রিটিশ আমলে বন্ধ হয়ে যায়। প্রাচীনতার কারণে এই মন্দিরকে ঘিরে বহু জনশ্রুতি রয়েছে।

এখান থেকে আমরা গেলাম জাদুগোড়ার ইউরেনিয়াম খনির দিকে। এটা ভারতের প্রথম ইউরেনিয়াম খনি। ঝাড়খণ্ডের পূর্ব সিংভূম জেলার জাদুগোড়া গ্রামে অবস্থিত। ইউরেনিয়াম ধাতু প্রচন্ড তেজস্ক্রিয় হওয়ার জন্য এই এরিয়া ভীষণভাবে প্রোটেক্টেড। তাই ট্যুরিস্টদের জন্য শুধু খনির প্রবেশদ্বার পর্যন্ত যাওয়ার অনুমতি আছে। প্রবেশদ্বার থেকে দেখতে পেলাম " ভাবা অ্যাটমিক রিসার্চ সেন্টারের মনিটরিং ল্যাবরেটরি ও ইউরেনিয়াম কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (UCIL) কর্মচারীদের রেসিডেন্সিয়াল এরিয়া। আমরা UCIL প্রবেশদ্বারের সামনে কয়েকটা ছবি তুললাম।

এরপর আমরা চললাম গালুডি ড্যামের দিকে। টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়া শুরু হয়ে গেছে। গাড়ি এগিয়ে চলল দূরে ছোট বোরো টিলার সমন্বয়ে তৈরি সিদ্ধেশ্বর পাহাড়ের রেঞ্জকে পিছনে ফেলে। অবশেষে পৌঁছে গেলাম গালুডি ড্যামে। তখন ও টিপটিপ করে বৃষ্টি পরে যাচ্ছে। ছাতা হাতে নিয়ে নেমে পড়লাম গাড়ি থেকে। সুবর্ণরেখা নদী যেন বর্ষার জল পেয়ে তার যৌবন ফায়ার পেয়েছে। দূরে পাহাড় দেখা যাচ্ছে আর বাদল মেঘের আড়াল থেকে আসা ভগ্ন সূর্যের আলোয় সুবর্ণরেখার জল রুপালি রঙে সেজেছে যেন। ড্যামের ওপরে নদী থেকে সদয় তোলা মাছ বিক্রি হচ্ছে। বেশ কিছু সংখ্যক স্থানীয় জেলেরা ড্যামের ওপর দাঁড়িয়ে তাদের ছোট ছোট জালে অভিনব কায়দায় মাছ(বাটা) তুলছে আর বিক্রি করছে বেশ সস্তায়। বাঙালি হয়ে সস্তায় টাটকা বাটা মাছ কিনবো না তা হয়? ওখান থেকে বেশ কয়েকটা মাছ কিনে নিলাম আমরা গেস্ট হাউসের কুক কে দিয়ে ফ্রাই করে খাওয়ার জন্যে। মেঘলা দিনে সূর্যাস্ত দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনা কম তাই আর অপেক্ষা নি করে আমরা ড্যামকে বিদায় জানিয়ে গেস্ট হাউসের দিকে রওনা দিলাম

আমাদের সারাদিন ঘোরাঘুরি করার ক্লান্তি ভুলিয়ে দিয়েছিল গেস্ট হাউসে রাতে কুক এর রান্না করা মুরগির ঝোল আর গরম গরম বাটা মাছ ভাজা।

আগের দিন পাহাড়ে চড়ার ফল সকালবেলায় বিছানা ছেড়ে উঠবার আগেই পুরো শরীর জানিয়ে দিল। এই আশঙ্কা করেই কাল রাতে একটা " ক্রোসিন " গলাধঃকরণ করেছিলাম। যাইহোক কোনক্রমে বিছানা ছেড়ে ব্যালকনিতে দাঁড়াতেই সবকিছু ভুলে গেলাম। এখানে পাহাড়ের রূপ প্রতি ঘন্টায় বদলায়। মনে হয় বসে বসে শুধু সেই বদলানো রূপ ই দেখি সবকিছু ফেলে। কিছুক্ষনের মধ্যেই বেশ জোরে বৃষ্টি শুরু হল। কালকের আবহাওয়া বেশ সাথ দিয়েছিল আমাদের। কাল মাঝেমধ্যে বৃষ্টি হলেও আমাদের ঘুরতে কোনো অসুবিধে হয়নি। আজ কে কি আবার সাথে দেবে আবহাওয়া ? এই আশঙ্কা থেকেই গেল মনের মধ্যে। একেবারে তৈরি হয়ে ব্রেকফাস্ট টেবিলে গিয়ে বসলাম। আজ সকাল সাড়ে আটটার মধ্যে গাড়ী আসবে। তবে বৃষ্টির তেজ ক্রমশঃ বাড়তেই থাকল। আমরা ঠিক সময়েই ব্রেকফাস্ট সেরে নিলাম। গাড়িও যথা সময়ে নিচে এসে অপেক্ষা করছে। মিনিট পনেরোর মধ্যে বৃষ্টি যখনই একটু ধরলো আমরা তাড়াতাড়ি গেস্ট হাউসের সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে সোজা গাড়ি তে বসলাম।

কাল থেকে গেস্টহাউস চত্বরের গাছের বাতাবিলেবু গুলো বড্ডো টানছিল। গেস্টহাউসের ছেলেগুলোকে বললাম, " আমাদের জন্যে দুটো পেড়ে রাখিস তো ! " ওরা মহা আনন্দে রাজি হয়ে গেল। গাছের নিচে বেশ কটা পরে নষ্ট হয়ে গেছে। খাওয়ার লোক নেই।

বৃষ্টির মধ্যেই আমাদের গাড়ি এগিয়ে চললো আজকের গন্তব্য স্থানগুলোর উদ্দেশ্যে। আজ আমরা যাবো 'রাতমোহনা (সুবর্ণরেখা নদীর তীর), বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়ের বসতবাড়ি, ফুলডুঙরি পাহাড়, বুরুডি লেক ও ধারাগিরি জলপ্রপাত দেখতে। রাস্তায় আরো কয়েকটা দর্শনীয় জায়গা পড়বে , সেগুলোও দেখে নেবো। এইসব জায়গা গুলো আমাদের লাঞ্চের আগেই দেখে নিতে হবে, কারণ বিকেলে জামশেদপুরে একটা ঝটিকা সফর করার প্ল্যান বানিয়ে রেখেছি আমরা।

আমাদের গাড়ি এগিয়ে চললো সুবর্ণরেখা নদী অভিমুখে। প্রথমেই পথে পড়লো HCL(হিন্দুস্থান কপার লিমিটেড) এর গেট। ঘাটশিলার মৌভাণ্ডার এলাকায় অবস্থিত। পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের কপার খনিগুলো থেকে তাম্র উত্তোলন ও পরিশোধন করার এই কারখানাটি নাকি ১৯১৩ সালে প্রথম শুরু হয়েছিল। ১৯৩০ সালে ' ইন্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন ' নামে একটি ব্রিটিশ কোম্পানি এটাকে অধিগ্রহণ করেছিল। পরবর্তীকালে ১৯৭২ সালে ভারত সরকার এটির জাতীয়করণ করে নতুন নাম দেয় ' হিন্দুস্থান কপার লিমিটেড' . বর্তমানে এই কপার ফ্যাক্টরীটি বছরে ১৯,০০০ টন রিফাইন্ড কপার (বিশুদ্ধ তামা) উৎপাদন করতে পারে। পর্যটকদের কেবলমাত্র গেট পর্যন্ত যেতে দেওয়া হয়। এখানে কোনো ছবি তোলা নিষিদ্ধ। তবু একটু আড়াল থেকে কোনোরকমে একটা গেটের ছবি নিয়ে নেওয়া হল স্মৃতিভাণ্ডারে জমা রাখার জন্য।

গেটের ঠিক উল্টোদিকে রাস্তার মোড়ে স্বাধীনতা যোদ্ধা 'বিরসা মুন্ডা' র পূর্ণাঙ্গ মূর্তি বেদির ওপর বসানো আছে। সন ১৯০০ এ ছোটনাগপুর ও তার সংলগ্ন অঞ্চলে মুন্ডা আদিবাসীদের জমি অধিগ্রহণকে কেন্দ্র করে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে মুন্ডা সম্প্রদায় যে শক্তিশালী বিদ্রোহ করেছিল তার প্রধান নেতা ছিলেন এই বিরসা মুন্ডা। আমরা বেদির কাছে দাঁড়িয়ে ফটো নিলাম।

আবার আমরা সুবর্ণরেখা নদীর উদ্দেশ্যে চললাম। এই পথটা ভারী সুন্দর ছিল। রাস্তার দুদিকে সাদা কাশফুল আমাদের ছবি তোলার জন্য দাঁড়াতে বাধ্য করল। কিছুদূর গিয়ে সুবর্ণরেখা নদীর তট। এই জায়গাটার নাম 'রাত মোহনা ' . কেউ কেউ বলে, নদীর রুপালি জলে যখন চাঁদের আলো পড়ে তখন সুবর্ণরেখা এক মোহময়ী রূপ ধারণ করে বলে এই নাম। আবার অন্য অনেকের ধারণা, একসময় প্রচুর জোনাকি পোকা রাতে সুবর্ণরেখার তীরকে আলোকসজ্জায় ভরিয়ে দিত, তার থেকেই এই নাম হয়েছে। আমরা দিনের বেলা গেছিলাম বলে এর কোনোটাই উপভোগ করতে পারিনি। কিন্তু বর্ষার জলে সুবর্ণরেখা পরিপুষ্ঠ হয়ে যে রূপ নিয়েছে তা দেখেই আমরা মুগ্ধ আর উল্লসিত হয়ে পড়লাম। তট সংলগ্ন একটা বাঁধানো পথ ধরে নদীর বেশ কিছুটা কাছে গেলাম। সেখানে জেলেরা বিভিন্ন কৌশলে মাছ ধরতে ব্যস্ত। নদীতে বেশ স্রোত আছে আর তার পাদদেশ পাথুরে হওয়ার জন্য নদী বেশ চঞ্চল। কোথাও নদী লাফিয়ে লাফিয়ে বয়ে চলেছে , তো কোথাও নদীর জল ঘূর্ণির মতো পাক খাচ্ছে। কিছুটা দূরেই দেখা যাচ্ছে কমবেশি জলধারার চারটে ঝর্ণা পাশের ছোট টিলা পাহাড় দিয়ে নেমে সুবর্ণরেখায় মিশছে। বর্ষার জলে এরাও বেশ পরিপুষ্ঠ। হয়তো অন্য সময়ে এদের ধারা বেশ ক্ষীণ হয়ে যায়। এখানে ঝর্ণার আর নদীর জলের শব্দ মিলেমিশে এক অদ্ভুত সুন্দর পরিবেশ। বেশ কিছুটা সময় এখানে ছিলাম আমরা।

পরবর্তী গন্তব্য বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বসল বাড়ির উদ্দেশ্যে। পথে জাতীয় সড়কের পাশেই পড়ল ফুলডুঙরি পাহাড়। পাহাড়ে চড়ার সাধ্য আমাদের ছিলনা , তবু খানিকটা চেষ্টা করলাম। লালমাটি আর শাল পলাশে ঘেরা এই ছোট টিলার সৌন্দর্য অন্য টিলাগুলির থেকে আলাদা। শুনেছি এই ফুলডুঙরি পাহাড় প্রকৃতি প্রেমিক সাহিত্যিক বিভূতিভূষণের বিশেষ পছন্দের জায়গা ছিল। তার বাড়ির কাছেই এই পাহাড়। এবার আমরা তাঁর বাড়ির দিকে চললাম।

খানিকটা গিয়েই আমরা পৌঁছে গেলাম বিভুতিভূষণের একসময়ের বাসভবন ' গৌরীকুঞ্জে '। গিয়ে দেখি সেখানে বেশ ধুমধাম চলছে। বাইরের রাস্তায় সারি দিয়ে গাড়ি দাঁড়ানো। বসতবাড়ি ও ওঁনার মূর্তি ফুলে ফুলে সাজানো। ওখানে পৌঁছনোর আগে পর্যন্ত আমাদের খেয়াল ই ছিল না যে সেদিন ই ছিল ওঁনার জন্মদিন (১২ই সেপ্টেম্বর) । আমরা যখন পৌঁছলাম তখন তারাদাস মঞ্চে চলছে ওঁনার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন। অঙ্কন প্রতিযোগিতার প্রদর্শন। আমরা এই উপরি পাওনাটা খুব খুশি। গৌরীকুঞ্জ (ওঁনার সহধর্মিনীর নাম নাম রাখা হয়েছে) এখন সংগ্রহশালা। আমরা বাড়িটার ভিতর ঘুরে ঘুরে ওনার অনেক পুরোনো ছবি ও ওনার ব্যবহৃত জিনিসপত্র দেখলাম।

এখন থেকে বেরিয়ে মাত্র ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে বিভিন্ন ফুলগাছ দিয়ে সাজানো ঘাটশিলার রামকৃষ্ণ মিশন। শান্ত পরিবেশ। মিশনের একদিকে দেখলাম দুর্গাপুজোর জন্য পুরোদমে চলছে প্রতিমা তৈরি।

এবার আমরা যাবো ' ধারাগিরি' জলপ্রপাত দেখতে। এই পথেই রয়েছে প্রায় ছয় কিলোমিটার দূরে বুরুডি লেক। লেকটা ফেরার পথে দেখবো বলে আমাদের গাড়ি ধারাগিরি জলপ্রপাতের দিকে এগিয়ে চললো। ভীষণ পাথুরে রাস্তা , গাড়িতে বেশ ঝাঁকুনি হচ্ছে। জঙ্গল ও ক্রমশঃ ঘন হচ্ছে। আশেপাশে বিক্ষিপ্ত কয়েকটা ঘর নিয়ে কয়েকটা গ্রাম। জঙ্গলের শুকনো ডালপালা , ফলমূল এবং অন্যান্য জিনিসের ওপর নির্ভর করেই চলে এখানে থাকা আদিবাসীদের জীবিকা নির্বাহ। বুরুডি লেক ছেড়ে প্রায় ২ কিমির মতো পথ এসে গাড়ি আর যাবে না। ধারাগিরি জলপ্রপাত এখনো ১ কিমি ওপরে। একটা জায়গায়

আমাদের গাড়ি থামলেই কয়েকটি আদিবাসী বাচ্ছা ছেলে দৌড়ে এলো। ড্রাইভার বললো, এদের কাউকে সঙ্গে নিয়ে যান ,ওরা পথ দেখিয়ে আপনাদের সঙ্গে নিয়ে যাবে জলপ্রপাত পর্যন্ত। ঠিক হলো, এদের মধ্যে রবি সিং (পথে যেতে যেতে নাম জেনেছিলাম) কিছু টাকার বিনিময়ে আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। রবি সিং হাতে একটা লাঠি নিয়ে ছোট বোরো পাথরের ওপর পা ফেলে আমাদের সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে চললো ঘন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে। রবি সিং গল্প করছে আর আমাদের গাইড করছে কোন পাথরে পা রাখতে হবে। এইটুকু পথ সত্যি ই দুর্গম। একে তো ঘন জঙ্গল , তার ওপর বর্ষার জলে ও নেমে আসা জলের ধারায় পাথর রীতিমতো পিচ্ছিল। ছোট্ট রবি সিং আমাদের বেশ সাহায্য করছিল। কিন্তু জলপ্রপাতের একদম কাছে পৌঁছেই আমাদের সব কষ্ট দূর হয়ে গেল। ঘন জঙ্গলের ভেতরে বড়ো কতকগুলো পাথরের ফাঁক দিয়ে রুপালি জলধারা ও সামান্য সূর্যরশ্মি প্রবেশ করছে আর সঙ্গে অবিরাম জলধারার শব্দ যেন জায়গাটাকে একেবারে অন্যরকম সুন্দর করে তুলেছে। ধারাগিরি পাহাড়ের মধ্যে প্রায় ২০ - ২৫ ফুট ওপর থেকে এই জলধারা নেমে ঘন জঙ্গলের ভেতরের পথ দিয়ে অবিরত বয়ে চলেছে। এক কথায় আমরা অভিভূত। এবার নামার পালা। পিচ্ছিল পাথুরে পথ(?) ওঠা যেমন কঠিন, তার থেকেও বেশি কঠিন নামা। নাম্বার সময় আমার বেশ কয়েকবার রবি সিংয়ের হাত ধরবার প্রয়োজন হয়েছিল। কিশোর নিষ্পাপ ছেলেটি প্রত্যেকবার আমাকে বিনা সংকোচে সাহায্য করেছে। আমরা নিচে নেমে ওর পারিশ্রমিক ছাড়াও আরো কিছু অতিরিক্ত দিয়ে গাড়িতে উঠে এলাম। ও হ্যাঁ , রবি সিং কে ক্যামেরা বন্দি করতে আমরা ভুলিনি।

ফেরার পথে আবার বুরুডি লেক এলো। ততক্ষনে আমাদের বেশ দেরি হয়ে গেছে। আবার জোরে বৃষ্টিও শুরু হয়ে গেল , তাই গাড়ির মধ্যে বসে থেকেই লেকের সৌন্দর্য যতটা পারলাম দেখলাম। পাহাড় দিয়ে ঘেরা বেশ বড়ো লেক। বোটিংয়ের ব্যবস্থাও আছে। পরে আবার কখনো এলে অবশ্যই ভালো করে দেখবো, এই আশা নিয়ে আমরা গেস্টহাউসের দিকে এগিয়ে চললাম।

ঘাটশিলার রামকৃষ্ণ মঠের সামনে

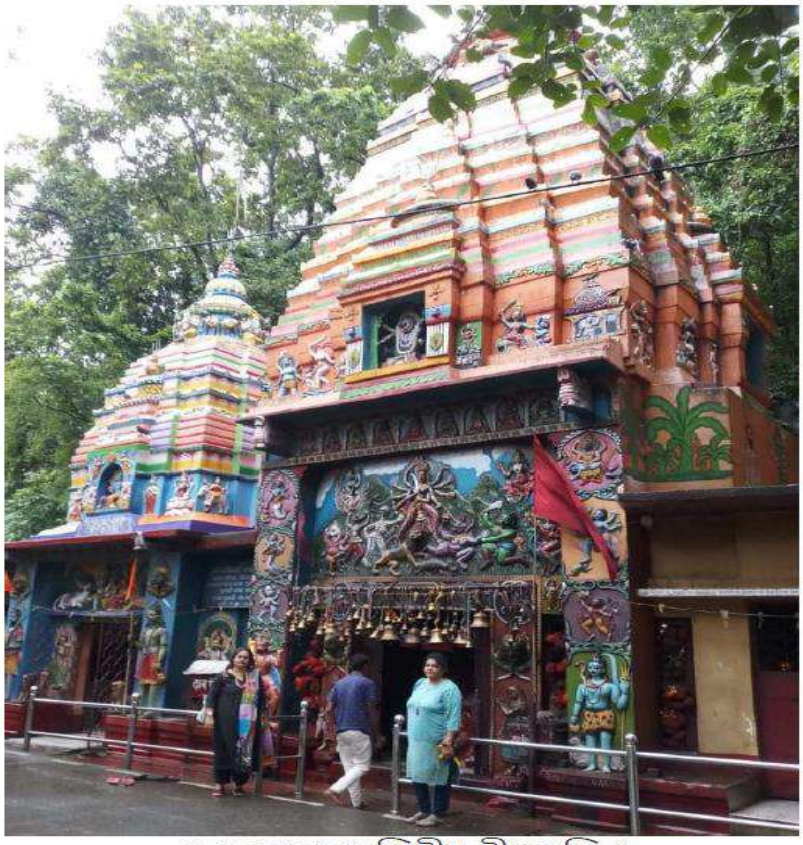

জাদুগোড়ার রঙ্কিনীদেবীর মন্দির

বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়ের বসত বাড়ির সামনে

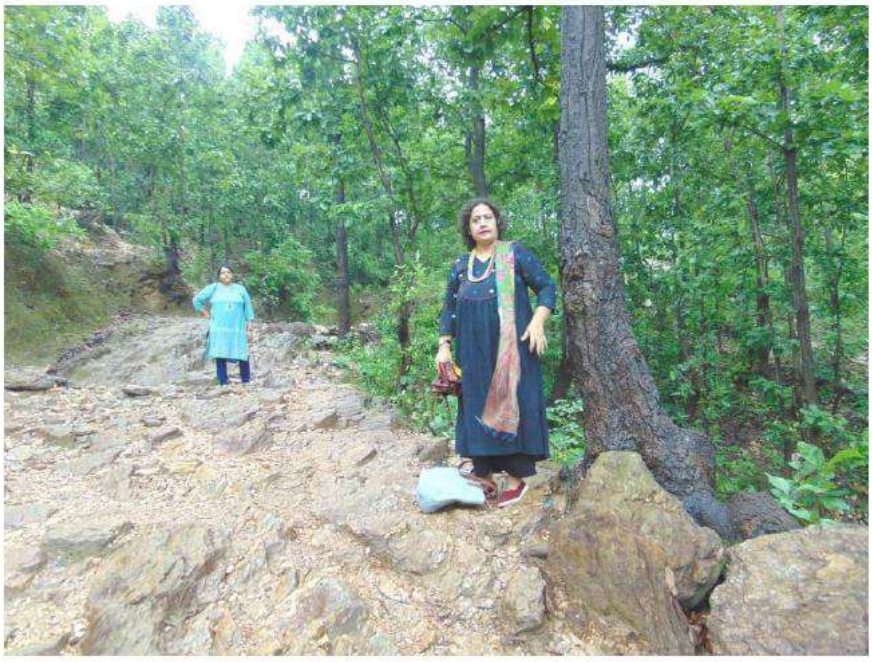

রাতমোহনার পাশে

সুবর্ণরেখা নদীর উপর গালুডি ড্যাম

বাংলাদেশের হৃদয় হতে তখন আপনি

মধুমিতা দাশ

ইচ্ছেটা ছিল অনেকদিনের সেই দেশটা দেখার, সুযোগও এসে গেল, শিক্ষকদিবসের প্রাক্কালে যাত্রা শুরু করলাম ১৪ জনের সাথে ARICARE এর সৌজন্যে।

বাংলাদেশগামী বাসের সামনে আমরা

৫ই সেপ্টেম্বর ২০২২ সোমবার , আজ একঝলক রবীন্দ্রনাথের কুঠিবাড়ি দেখেছি, কুষ্টিয়াতে রাত্রি যাপন। বেনাপোল থেকে হোটেল পর্যন্ত দুধারে কেবল সবুজ আর সবুজ। ধান, নানারকম সবজি, পানের বরজ কি নেই, চোখ জুড়িয়ে যায় দেখলে।

৬ই সেপ্টেম্বর ২০২২, আজ প্রথম দেখলাম লালন ফকিরের মাজার, শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথের কুঠিবাড়ি, এই কুঠিবাড়ির সামনে একজন দোকানদারের সাথে গল্প করে জানতে পারলাম, ও রবিঠাকুরের প্রায় সব বই পড়েছে, এছাড়াও জুলভার্ন পড়েছে, পড়েছে হুমায়ুন আহমেদের মিসির আলি , হিমুর গল্প, খুব ভালো লাগলো গল্প করে। চাঁচরের একটি প্রাচীন আটচালা শিবমন্দির , তারপর ঝাঁপবাওরের ওপর ঝুলন্ত সেতুর ওপর বেরিয়ে ফিরতে না ফিরতে রাত নেমে এলো যশোরে।

লালন ফকিরের মাজারের কিছু মুহূর্ত

শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথের বাসস্থানের ও স্মৃতিসৌধের সংগ্রহশালার ছবি

ঝুলন্ত সেতুর এক ঝলক

যশোরের হোটেলের সামনে আমরা সবাই

সাগরদাঁড়ি গ্রামে মাইকেল মধুসূদন দত্তের বাড়ী

মাইকেল মধুসূদন দত্তের বাড়ি

একটি বড়ো পুকুর যার চারধারে থরে থরে কবির কবিতা সাজিয়ে রাখা আছে। তারপর কইলাম কপোতাক্ষ যদি দেখতে, কবির ঘরে না ফেরার দুঃখটা অনুভব করা যায় তার কবিতার মাধ্যমে।

বৃষ্টি পড়া শুরু হয়েছে, তারই মধ্যে বৃষ্টি ভেজা খুলনার দক্ষিণডিহিতে রবীন্দ্রনাথের শ্বশুরবাড়িটি বড়ো মনোরম।

দক্ষিণ ডিহিতে রবীন্দ্রনাথের শ্বশুরবাড়ি

৮ই সেপ্টেম্বর, ২০২২ বৃহস্পতিবার বরিশালের ব্রজমোহন সংক্ষেপে বি এম কলেজ, জীবনানন্দ দাশ এই কলেজে অধ্যাপনা করতেন। দুঃখের কথা কবির ধানসিঁড়ি বাড়িটির কোনো চিহ্ন নজরে এলোনা , বড়ো অবহেলা নাটোরের বনলতা সেনের। বাড়ি না ফিরতে পারার যন্ত্রনা বারবার যেমনভাবে মাইকেল মধুসূদন আর জীবনানন্দের কবিতাতে ফুটে উঠেছে, পড়তে পড়তে পরবাসে থাকার বেদনায় একাত্ম হয়ে যাই, দেশভাগ তাহলে কত লক্ষ লক্ষ লোকের যন্ত্রণার কারণ হয়েছে, ভেবে বিষণ্ন বোধ করি।

ধান নদী খাল এই তিনে বরিশাল, এখানকার গুইঠা মিষ্টি আর বিলাতী আমড়া না খেয়ে এই জায়গা ছাড়া যায়না।

বরিশালে বেড়ানোর সময় ধরে রাখা কিছু ছবি

এক সন্ধ্যাতে তৈরি হয়ে এক সন্ধ্যাতে শেষ হয়েছে তাই নদীটির নাম 'সন্ধ্যা ' , এই নদীতে লঞ্চে করে গোয়াভা দ্বীপের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু হলো, এই নদী থেকে একটা back water খাল তৈরী হয়েছে , যার দুধারে বিলাতি আমড়ার ব্যাপক চাষ হচ্ছে , সেখানে সারাদিন ঘুরে বেড়ালাম।

বাস ছুটে চলেছে। কতো বাড়ী ঘর দোর পেরিয়ে পদ্মা সেতুর ওপর দিয়ে রাজধানীর পথে, এখানকার জ্যাম কলকাতার কথা মনে পরিয়ে দেয়। আজ ঢাকাতে রাত্রিযাপন।

৯ই সেপ্টেম্বর, ২০২২, শুক্রবার, বাংলাদেশে রবিবার, ঢাকেশ্বরী ঢাকার সবচেয়ে পুরোনো মন্দির, এই মন্দিরে দূর্গা প্রতিমা প্রতি বছর মহালয়ার দিন বিসর্জন হয়, আর ষষ্ঠীর দিন নতুন প্রতিমা আনা হয়।

ঢাকেশ্বরী কালীবাড়ি

আহা, শুধু বাংলাতে কথা বলবে বলে কত লোক বলি হয়েছে, ঢাকার ভাষা শহীদ স্তম্ভ তাই সরবে ঘোষণা করছে আ মরি বাংলাভাষা মোদের গরব মোদের আশা।

ভাষা শহীদ স্মারক স্তম্ভ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় , এখানে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম চিরনিদ্রায় শায়িত।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের সামনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি রসায়ন বিভাগের আমরা কজন প্রাক্তনী

বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমানের বাড়ি যেখানে ওনাকে মারা হয়েছিল।

সংসদ ভবন পেরিয়ে গাড়ী চলল খাবার দোকানের সন্ধানে। ঢাকার নিউ মার্কেট আর চাঁদনী চকের ভিড় বড়ো বড়ো জায়গাকে হার মানায়।

১০ই সেপ্টেম্বর, ২০২২ শনিবার, চট্টগ্রামের পতেঙ্গা সমুদ্র তীর, সাঁ সাঁ করে হাওয়া দিচ্ছে, ভাজা বাদাম ১২০ টাকা কিলো , একটা কদবেল ৪০ টাকা, পালস লজেন্স একটা ২ টাকা। এখানে শুঁটকি মাছ আর অনেক ধরণের আচার পাওয়া যাচ্ছে।

চট্টগ্রামের পতেঙ্গা সমুদ্রতীর

চট্টেশ্বরী কালীমন্দির একদম শহরের মধ্যে , তা প্রায় ৩৫০ বছরের পুরোনো, সূর্য সেনের সহযোগী অম্বিকা রায় ওই মন্দিরের এখনকার পুরোহিতের বাবার বন্ধু ছিলেন। আদি মূর্তিটি ইংরেজরা মন্দিরের পুকুরে ফেলে দিয়েছিল পরে বিচারপতি পদ্মা খাস্তগীর একটি পাথরের কালীমূর্তি তৈরি করে দেন।

চট্টেশ্বরী কালীমন্দির

পরেরদিন জিয়াউর রহমানকে, যে সার্কিট হাউসে হত্যা করা হয়েছিল সেটা দেখে রাঙামাটির উদ্দেশ্যে রওনা হলাম।

পথে একটি মাজার, তার সামনের পুকুরে একটা বড়ো কচ্ছপ নির্ভাবনায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, ইচ্ছে ছিল প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের কোনো স্মারক দেখবো, হলো না। যেখানে ইংরেজদের অস্ত্র লুঠ করে রাখা হয়েছিল সেটা বর্তমানে বি এস এন এলের অফিস। ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে সূর্য্য সেনের অবদান সর্বজন স্বীকৃত, তার কিছু নিদর্শন না দেখে ক্ষুণ্ন মনে রওনা হলাম পরের গন্তব্যের উদ্দেশ্যে। রাঙামাটি চট্টগ্রামের পাহাড়ি অঞ্চল, ঘন ঘন চেক হচ্ছিল রাস্তায় যেমনটা হয় আমাদের উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যে।

চট্টগ্রাম থেকে রাঙামাটি যাওয়ার পথে মুক্তিযোদ্ধাদের একটি স্মৃতিসৌধ

রাঙামাটির কাস্তাই লেক, সেই লেকে নৌকা ভ্রমণ , আর লেকের ওপর ঝুলন্ত সেতু দেখতে ভালো লেগেছে।

বৌদ্ধবিহার (রাজবানা বিহার)

কাস্তাই লেকের ওপর ঝুলন্ত সেতু আর লেকের পাশে ঝর্ণার সামনে আমরা কজন

বান্দরবনের পাহাড়ি রাস্তা, নদনদী পেরিয়ে আজকের যাত্রা সমাপ্ত হল কক্সবাজারে।

কক্সবাজারে স্পিড বোটে করে আদিনাথ মন্দির দর্শন, বৌদ্ধবিহার দেখা একটি স্মরণীয় অভিজ্ঞতা।

আদিনাথ মন্দির

কক্সবাজারের বিখ্যাত বৌদ্ধবিহার আর রামু মৈত্রী বিহার

কক্সবাজারের বিশাল সমুদ্রতীরে অনেকক্ষন ঘুরে বেড়ালাম, সমুদ্র এখানে শান্ত, মত ঢেউ নেই।

কক্সবাজারের সমুদ্রতীরে আমরা

পরের দিন অর্থাৎ ১৫ই সেপ্টেম্বর, ২০২২ বাস ছুটে চলল কুমিল্লার পথে, কুমিল্লাতে দেখলাম ময়নামতী জাদুঘর, বৌদ্ধবিহার এইসব।

কুমিল্লার ময়নামতী জাদুঘর ও বৌদ্ধবিহারের এক ঝলক

কুমিল্লা থেকে চাঁদপুর, এটা বাংলাদেশের ইলিশের বাড়ী , চাঁদপুরে দুটো নদী এসে মিশেছে।

ইলিশের বাড়ীর কিছু ছবি (চাঁদপুর)

এখানে ইলিশ উৎসবে অনেক মাছ খাওয়া হলো , ইলিশের বাড়ি ছেড়ে আবার রাজধানীর পথে , ঢাকাতে তথা বাংলাদেশে অদ্যই শেষ রজনী।

১৬ই সেপ্টেম্বর , ২০২২ ঢাকা কলকাতা মৈত্রী বাসে ফিরে যাওয়ার পালা। পরিশেষে জানাই, বাংলাদেশের সাধারণ মানুষেরা খুব আন্তরিক , খুব সহজে অন্যদের আপন করে নিতে পারে ,আহা , যদি বাংলা ভাগ না হতো !!

বেনাপোল পেরোতেই চতুর্দিকে পুজো প্যান্ডেল মনে পড়িয়ে দেয় দুর্গাপুজো আসছে, রাত ৭.২০ তে বাড়ীর বাস স্টপেজে নামলাম।

.

কৃষ্ণাভিসার

উৎপলা পার্থসারথি

সংস্কৃতে " কৃষ্ণ " শব্দটির অর্থ কালো, বা ঘন নীল। কৃষ্ণের মূর্তিগুলিতে তাঁর গায়ের রং সাধারণত কালো এবং ছবিতে নীল দেখানো হয়ে থাকে। কৃষ্ণ নামের অর্থ সংক্রান্ত একাধিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। তবে মহাভারতের উদ্যোগপর্বে (৫/৭১/৪) বলা হয়েছে কৃষ্ণ শব্দটি কৃষ এবং ণ এই দুটি মূল থেকে উৎপন্ন। কৃষ শব্দের অর্থ টেনে আনা বা কর্ষণ করা ; সেই সূত্রে শব্দটি ভূ বা পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। ণ শব্দটিকে নিবৃত্তি শব্দের প্রতিভূ ধরা হয়। এখানে ভূ শব্দটির নিহিত অর্থ আকর্ষণীয় অস্তিত্ব ; অর্থাৎ কৃষ্ণ শব্দের অর্থ আকর্ষণীয় ব্যক্তি বলেই ধরা হয়।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অনন্ত বিশ্বব্রহ্মান্ড স্বরূপ, তাই তাঁকে কালো দেখায়, কিন্তু বাস্তবে তার কোনো বর্ণ হয় না, বা তিনি সব বর্ণের যুক্ত প্রভাব তাই কালো। তাঁকে নীল বর্ণের দেখানোর পিছনেও একটা কারণ আছে। আমরা পৃথিবী থেকে যে আকাশ দেখি তা বাস্তবে অনন্ত মহাবিশ্ব, যা কালো হলেও পৃথিবীর বায়ুমন্ডলের কারণে নীল দেখায়। এই সত্যটি বোঝানোর জন্যই ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে নীল ও দেখানো হয়।

কৃষ্ণ বা শ্রীকৃষ্ণ হলেন সনাতন হিন্দু ধর্মের পুরুষোত্তম ভগবান। পুরাণ অনুযায়ী তিনি বিষ্ণুর অষ্টম অবতার তাঁকে ঈশ্বরের পরম স্বত্বা উপাধিতে ভূষিত করা হয় এবং তিনি হিন্দু ধর্মগ্রন্থ ভগবৎ গীতার প্রবর্তক।

সনাতন ধর্ম হচ্ছে হিন্দুধর্মের প্রকৃত নাম। সংস্কৃতে এই শব্দবন্ধটির অর্থ হল " চিরন্তন ধর্ম" বা " চিরন্তন পন্থা"। এর অনুসারীগণ সনাতন ধর্মকে অ পরিবর্তনশীল(যা ছিল, আছে এবং থাকবে)বলে মনে করেন। অর্থাৎ যে ধর্মের কখনো পরিবর্তন বা বিনাশ হয় না, তাই সনাতন ধর্ম। প্রধানত কৃষ্ণকে আমরা মহাভারতে দেখি ধর্মরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্ব দানকারী একজন প্রাচীন ভারতীয় রাজপুত্র ও রাজার ভূমিকায় আজ থেকে প্রায় ৫০০০ বৎসর পূর্বে অবতীর্ন হয়েছিলেন। আবার ভগবৎ পুরাণ কৃষ্ণকে প্রায়শই বংশীবাদনরত এক কিশোরের রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। আবার ভগবদগীতায় তিনি এক পথপ্রদর্শক, একজন কূটনীতিজ্ঞ হিসাবে পাণ্ডবপক্ষে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি আমাদের মধ্যে যুগে যুগে নানারূপে বিরাজিত হয়েছেন। তিনি একাধারে দেবগুনা শিশু, রঙ্গ কৌতুক প্রিয় এক আকর্ষণীয় পুরুষ , আদর্শ প্রেমিক , দিব্য নায়ক ও পরম ঈশ্বর। সনাতন ধর্ম জেক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে তুলনা করেন, সেই কৃষ্ণ মহিমা তাঁর স্বরূপ এবং তাঁর কাজের বিবরণ

দেওয়া কি এতো সহজ ? হিন্দু সমাজ যাঁকে তার অস্তিত্ব বলে মনে করেন তাঁকে কিভাবে এই সামান্য লেখনীতে আঁকা যাবে ? তাই এই প্রবন্ধে বৈষ্ণব পদাবলীর অভিসার পর্ব নিয়ে সামান্য কিছু নিবন্ধ করার চেষ্টা করছি।

কৃষ্ণ সংক্রান্ত উপাখ্যানগুলি মূলত লিখিত আছে মহাভারত, হরিবংশ , ভাগবত পুরাণ ও বিষ্ণু পুরান গ্রন্থে। তবে বাংলা সাহিত্য বৈষ্ণব পদাবলী বা বৈষ্ণব স্বধর্মতত্ত্বের রসভাষ্য নাম খ্যাত এক শ্রেণীর ধর্মসংগীত রচনা শুরু হয় চতুর্দশ শতকে বিদ্যাপতি ও চন্ডিদাসের সময়। তবে ষোড়শ শতকে এই সাহিত্যের বিকাশ হয় এবং এর প্রধান অবলম্বন হয় রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা। বৈষ্ণব পদাবলীতে পাঁচরকম রসের কথা বলা হয়েছে - শান্তরস, দাস্যরস, সখ্যরস, বাৎসল্যরস ও মধুরস। শান্তরসে কৃষ্ণ ভগবান রূপে পাঠকের কাছে ধরা দেন। এরপর ধীরে ধীরে প্রতিটি রসের মধ্যে দিয়ে ভগবান রূপ পরিত্যাগ করে মানব রূপে পাঠকের কাছে ধরা দিতে থাকেন এবং মধুরসে পুরোপুরি মানব রূপে পাঠককুলের কাছে আত্মপ্রকাশ করেন। এই মধুরসকে আবার রাধাকৃষ্ণের অভিসার বলেও অংকিত করা হয়। হাজার হাজার গান ও শ্লোক রচিত হয়েছে এই অভিসার পর্ব নিয়ে বিশেষত গ্রামবাংলা ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে। অভিসার শব্দের অর্থ " সংকেত স্থানে গমন" কিন্তু ক্রমশ এটি প্রেমিক প্রেমিকার মিলনের উদ্দেশ্যে পরস্পরের অভিমুখে যাত্রাকেই বোঝানো শুরু করে। শ্রী রূপ গোস্বামী " উজ্বল নীলমনি" গ্রন্থে লিখেছেন

" যযাভিসারয়তে কান্ত স্বয়ং ব্যাভিসরত্যপি।

সা জ্যোৎস্না তামসী যান যোগ্যবাসাভিসারিকা। "

যে নায়িকা আকুল ভাবে প্রিয়ের সাথে মিলিত হবার জন্য যাত্রা করেন তাঁকেই অভিসারিকা বলা হয়ে থাকে।

"রসকল্পবল্লীতে " নিকুঞ্জকানন, উদ্যান, জলশূন্য পরিখা , অট্টালিকার গবাক্ষ , নদীতীরের কন্টক যুক্ত বাঁধ, গৃহের পেছনের অংশ , ভাঙা মঠ এবং মন্দিরকে অভিসারের সংকেত স্থান হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। অভিসার পর্যায়ের বিশেষত্ব, প্রকৃতি এখানে রাধাকৃষ্ণের মিলনের পথে প্রতিকূল ভূমিকায় গ্রহণ করেছে।

সেই প্রতিকূলতার কষ্টিপাথরে যাচাই হয়েছে রাধা নিকষিত হেমতুল্য কৃষ্ণপ্রেম। রাধা সমস্ত বাধা বিঘ্নকে জয় করে অধ্যাত্ম পথযাত্রী। তার সেই অভিসারকে অনেকে জীবাত্মার সাথে পরমাত্মার মিলন হওয়ার জন্য দুর্গম গিরি, কান্তার মরু অতিক্রম করার কথা বলেছেন। কিন্তু পদাবলিসাহিত্যে রাধা কখনোই কৃষ্ণের জীবাত্মার প্রতীক নয়। হ্লাদিনী শক্তির স্বরূপ।

অভিসার পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবি গোবিন্দদাস। অভিসারের মধ্যে যে বিপুল গভীর আবেগ , অতন্দ্রনীস্থ, দুরূহকে দুর্গমকে সুগম করে অভিষ্ঠকে প্রাপ্ত করা তা গোবিন্দদাসের অভিসার বিষয়ক পদে পরিপূর্ন রূপে প্রকাশ হতে দেখতে পাওয়া যায়।

অভিসারের কল্পনা কিছু মৌলিক নয়। সৃষ্টির প্রাক কাল থেকে বিবর্তনের পথে মানবজীবনের অগ্রগতির সাথে অভিসারের কল্পনার এতো ঘনিষ্ঠতা আছে যে , যা কিছু কৃচ্ছসাধনায় লভ্য, তাই অভিসার - জীবনাভিসার। মানবজীবনের দুই গতি - এক, অসীম অতীত হতে অনন্ত ভবিষ্যতের অভিমুখে পথ পরিক্রমা ; অন্যটি সেই পথ চলতে চলতে আত্মপ্রেমস্বীয় কামনা বাসনার চতুর্দিকে চক্রাকারে ঘোড়া। মানবীয় প্রেম বহু পূর্বকালেই অভিসার আখ্যা পেয়েছে।

গোবিন্দদাস অভিসারিকা রাধার সামনে পরিব্যাপ্ত বিশ্ব প্রকৃতির ছবি এঁকেছেন। বর্ষাভিসারে দেখা গেছে অভিসারিকা রাধার সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা, প্রকৃতির প্রতিকূলতা যখন সবচেয়ে তীব্র।

এই অভিসারিকা আসন্ন সাধনায় সিদ্ধিলাভের উপযোগী হওয়ার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে আগ্রহী, এখানে পদগুলি অভিসারিকার অভ্যাসজত সংক্রান্ত, দেহে, মনে সামর্থ্য সংগ্রহের প্রস্তুতির অধ্যায় -

" কন্টকগাড়ি কমলসমপদতল

মঞ্জীর চিরোহী ঝাঁপি।

গাগরী বাড়ি ঢালী করি পিছল

চলতঃই অঙ্গুলি চাপি। "

কেবল জল ঢেলে কাঁটা মাড়িয়ে সাধনা নয়, যেখানে সর্বাধিক ভীতি ও সর্বাধিক প্রীতি সেই দ্বৈতকেই জয় করতে হবে, তবেই সে পাবে দয়িত কৃষ্ণকে। পথে আছে সাপের ভয় তাই নিজের কঙ্কন মূল্য দিয়ে সাপের মুখ বাঁধার কৌশল শিক্ষা করেন।

“করকঙ্কন পণ ফনীমুখ বন্ধন

শিখই ভুজগ গুরু পাশে। "

কতদূর দুর্গম পথ, সিদ্ধি কত কঠিন, বিঘ্ন বিপদ, বাধা সব যেন তাঁকে চেপে ধরেছে, শুধু সমাজসংসার নয়, বিশ্বপ্রকৃতি ও তার ওপর বিরূপ। গোবিন্দদাস তাঁর লেখাতে ও খুব সুন্দর ভাবে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন অভিষ্ঠ পেতে গেলে মানুষকে কতটা দৃঢ় হতে হয়। "কৃষ্ণপ্রেমে পাগলিনী রাধা " কথাটার অন্তর্নিহিত অর্থ খুব কঠিন তাকে একমাত্র প্রকৃত ভক্ত ই বুঝতে বা জানতে পারে।

অন্যদিকে আবার গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে গোবিন্দদাস মহাভাবময়ী রাধার চিত্র আঁকেননি। এক প্রেমিকা নারীর প্রেম গৌরবকে তুলে ধরেছেন। প্রেমের দেবতা জেক কোটি কোটি বান বর্ষণ করেছেন , মেঘের দেবতা যাকে স্পর্শ করতে পারেনা, প্রেমানল যার হৃদয়ে অহর্নিশ জ্বলছে, সেই রাধা নবকলিকার মত কৃষ্ণের কাছে সমর্পিত প্রাণ -

" তুয়া দরশনে আশে কিছু নাহি জানলু

চিরদুঃখ অব দূরে গেল। "

গোবিন্দদাস তার লেখনীর পদে বিঘ্ন বিজয়িনী রাধার প্রেম তপস্যার চূড়ান্ত চিত্রণ প্রতিভাত করেছেন।

" তোহেরি মুরলি যব শ্রবণে প্রবেশল

ছোড়লু গৃহসুখ আশ। "

গোবিন্দদাসের পদাবলীর মধ্যে আছে একটা অনিবার্য প্রাণাবেগ, সুদুর্জয় আত্মবিশ্বাস , অতন্দ্রসাধন দীপ্তি , অপরিসীম উৎকন্ঠার যন্ত্রনাময় আকুতি যা শুধু প্রেমলীলা বৈচিত্র্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।

বৈষ্ণব লীলাবাদী কবি গোবিন্দদাস কোথাও থামেননি। চলতে চলতে তিনি কৃষ্ণ কে সন্ধান করেন। রাধার ভগবান ও দাঁড়িয়ে নেই। তিনি বাঁশি বাজিয়ে এগিয়ে আসছেন। ভক্তের আকর্ষণে ভগবান তার থেকে দূরে থাকতে পারেন না, আবার অন্যদিকে অলক্ষিত কৃষ্ণের আকর্ষণে ধরা দিয়ে পথ চলার ইতিহাসই রাধা অভিসারের মূল কথা।

রাধাকৃষ্ণের স্বর্গীয় প্রেমকাহিনী মানবিক হয়ে উঠেছে বারবার। তাদের প্রেমের তীব্রতা এত বেশি যে তারা মনবেদনা ঘোষণা করেছেন সগৌরবে। কৃষ্ণ শুন্য বৃন্দাবনে বিরহিনী রাধার হৃদয়ে ব্যাথা ছড়িয়ে পড়ে প্রকৃতির চারপাশে। প্রকৃতির নানা ঋতুতে বৈচিত্র ফুটে ওঠে রাধাকৃষ্ণ প্রেমাখ্যানে।

" এ সখি হামারি দুঃখের নাহি ওর

এ ভরা বাদর মাগ ভাদর , শুন্য মন্দির মোর "

শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে বিরহিনী রাধা শ্যাম দর্শনে আকুল পূর্ব স্মৃতি আলোরণে ব্যস্ত, অন্যদিকে কৃষ্ণ আড়াল থেকে বংশীধ্বনিতেই রাধাকে ব্যাকুল করে তোলেন।

" সই কে বা শুনাইল কৃষ্ণনাম , কানের ভিতর দিয়া মর্মে পশিল গো আকুল হইল মোর প্রাণ "

কখনো কোন পদে আবার প্রশ্ন ওঠে কৃষ্ণ রাধাকে এত কষ্ট কেন দেন , বিয়ে কেন করেন না? তাতে উত্তর দিয়েছেন স্বয়ং কৃষ্ণ - হে রাধে তুমি আর আমি তো একই সত্বা , একই আধার ভিন্ন স্বরূপে দুই ভিন্ন বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং পরমব্রহ্ম। তাঁর থেকেই জগতে সমস্ত কিছু প্রকাশিত হয়েছে - অহং সর্বস্য প্রভবঃ মত্ত সর্বং পর্বততে (ভ .গী. ১০.৮)

ব্রহ্মসংহিতায় শ্রীকৃষ্ণকে অনাদির আদি বলে সম্বোধন করা হয়েছে। তিনি সৃষ্টি - স্হিতি - বিনাশ , সমস্ত কিছুর মূল কারণ - জন্মাদ্যস্যযত (ভা ১.১.১)

তাঁর শক্তিতেই বিষ্ণু পালন করেন, ব্রহ্মা সৃজন করেন ও শিব সংহার করেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অনন্ত শক্তির আধার। তবুও তাঁর শক্তিকে প্রধানত তিনভাবে ভাগ করা হয়েছে - অন্তরঙ্গা শক্তি, বহিরঙ্গা শক্তি ও তটস্থা শক্তি। তটস্থা শক্তি হচ্ছে জীবশক্তি। এই জীবশক্তি বোঝাবার জন্যই তিনি পুরুষ ও প্রকৃতি - রাধা ও কৃষ্ণ রূপে প্রকাশিত হয়েছেন আর প্রেমরস বিতরণ করেছেন যা এই জীব জগৎকে ধরে রেখেছে এই জীবনাভিসার কে পরিচালিত করছে।

Unakoti – Mythological Wonder in Tripura

Reena Datta and Mrinmoy Datta

Tripura in North East India has a District in the North Tripura ,named as Unakoti and its Kailashahar subdivision has Sculptural emplem having rock carvings of innumerable images of Gods and Goddesses. These carvings made on rocks, present in Raghunandan Hills of Tripura , are one less than one crore (99,99,999) and as such, the place is literally known as “Unakoti “, famously known as **Angkor Wat of the North-East** named as Cambodia’s Wat Temple. It is a place of worship with huge rock reliefs celebrating Shiva. In the local *Kokborok* language, it is called *Subrai Khung*. It is yet to be recognized as a UNESCO world Heritage site listed in 2022 .

The images found at Unakoti are of two types: namely rock-carved figures and stone images. Among the rock-cut carvings, the central Shiva head and Gigantic Ganesha images , deserve special mention. The central Shiva head known as **Unakotiswara Kal Bhairava** is about 30 feet high including an embroidered head-dress which itself is 10 feet high. On each side of the head-dress of the central Shiva, there are two full-size female figures - one of Durga standing on a lion and another female figure on the other side. Figures of Hanumana, Ganesha, Ravana and other deities from Hindu mythology are sculpted to perfection. In addition, three enormous images of Nandi Bull are found half-buried in the ground. There are various other stone as well as rock-cut images at Unakoti. Every year a big fair popularly known as **Ashokastami Mela** is held in the month of April. The festival is visited by thousands of pilgrims. Another smaller festival takes place in January.

According to Hindu mythology, Lord Shiva once spent a night here on way to Kashi(Benaras). Lord Shiva was followed by 99,99,999 gods and goddesses . Lord had asked his followers to wake up before sunrise and make their way towards Kashi. Unfortunately, none awoke, except Lord Shiva himself. Before he set out for Kashi alone, he put a curse on the others, turning them to stone and that is how the site got its name. It is ‘Shaiba’ (Saivite) pilgrimage and dates back to 7th – 9th centuries if not earlier.

It was believed by Local tribals that the maker of these idols was Kallu Kumhar. He was a devotee of Parvati and wanted to accompany Shiva-Parvati to their heavenly abode on Mount Kailash. On Parvati's insistence, Shiva agreed to take Kallu to Kailash, but for this a condition was kept that he would have to make one crore idols of Shiva in one night. Kallu got involved in this work of making idols overnight. But when dawn broke, the idols turned out to be one less than one crore. Shiva left Kallu the potter with his idols in Unakoti, making this an excuse of his inability to complete the task of one crore idol

Unakoti lies 178 km to the northeast from Agartala which has the closest airport, 8 km to the east from Kailashahar, district headquarters of Unakoti district,148 km to the south-east from Silchar. The nearest railway station is 19.6 km away at Dharmanagar railway station on the Lumding–Sabroom section. From Dharmanagar railway station it takes about 30–40 minutes by car. Travelling from capital town Agartala has become much easier nowadays. The morning train from Agartala reaches Dharmanagar before 10 am. The afternoon train from Dharmanagar reaches Agartala by 8 PM.

The site, added to the tentative list of UNESCO World Heritage in 2022 , has suffered centuries of neglect causing degradation and loss of considerable scale to the rock art. Since its adoption by the ASI (Archaeological Survey of India) as a heritage site, the situation has slightly improved, though a lot of work including substantial excavation remains to be undertaken.

A view of Unokoti Images carved on Hill Rocks

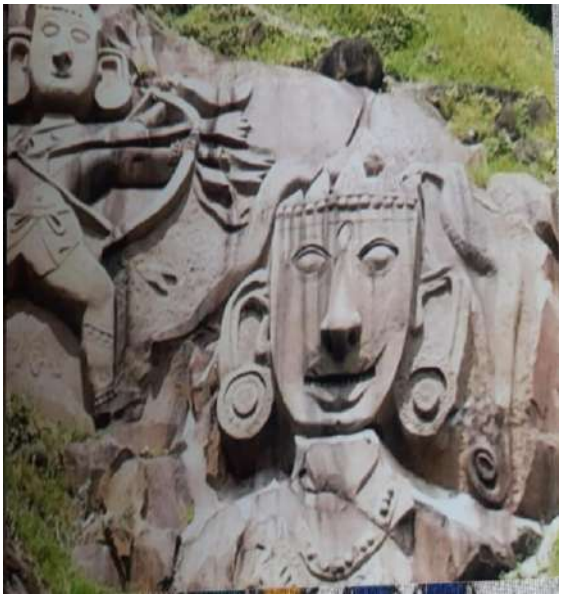

A closer view of Durga Idol Carved on Hills

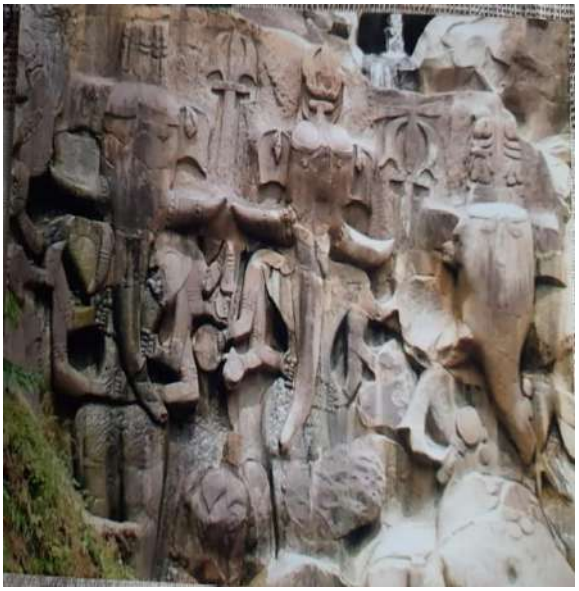

Images of Gods and Goddesses as carved

মজার মানুষ আইনস্টাইন

ডঃ দেবাঞ্জন সুর

এলবার্ট আইনস্টাইন কে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ পদার্থবিজ্ঞানী বলে মনে করা হয়। পদার্থবিজ্ঞানী হিসেবে 'বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ (special theory of Relativity)' ও 'সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ (General Theory of Relativity)' তত্ব দুটির উদ্ভাবনার জন্যে তাঁর জনপ্রিয়তা শুধু বিজ্ঞানীমহলেই আবদ্ধ থাকেনি। সাধারণ মানুষের মধ্যেও তা ছড়িয়ে পড়েছিল। এই মানুষটি যদিও বিজ্ঞানের ক্রিয়া - প্রক্রিয়ার জটিলতার সমাধানে নিমগ্ন ছিলেন , কিন্তু ব্যাক্তি হিসেবে ছিলেন অতি সরল ও এক মজার মানুষ। নিচে উল্লেখিত কয়েকটি আখ্যানের মাধ্যমে , এই বিরল প্রতিভাধর মানুষটির সামাজিক পরিসরে চলন - বলনের একটি ধারণা পাবেন পাঠকেরা আশাকরি।

ওনার ছোটবেলা থেকেই শুরু করা যাক। আইনস্টাইন বেশ দেরিতে কথা বলতে শুরু করেন , প্রায় চার বছর বয়স থেকে। এই দেরিতে কথা বলা নিয়ে তাঁর মা-বাবা বেশ চিন্তিত ছিলেন। একদিন রাতে , আইনস্টাইন বাবা-মার্ সাথে খেতে বসে হঠাৎ বলে উঠলেন, " এই স্যুপ টা খুব গরম। " চার বছর পরে সন্তানকে হঠাৎ কথা বলতে শুনে মা তাঁকে জিজ্ঞেস করেন , " তুমি আগে এভাবে কখনো কথা বলোনি কেন?" উত্তরে শিশু আইনস্টাইন বলেছিলেন , " কারণ এর আগে পর্যন্ত সবকিছুই ঠিক ছিল। স্যুপ ও কখনো গরম ছিলোনা। "

এবার দেওয়া যাক আইনস্টাইনের বুদ্ধিদীপ্ত রসিকতার এক নিদর্শন। বিখ্যাত অভিনেতা চার্লি চাপলিনের সিনেমা " সিটি নাইটস"-এর একটি প্রদর্শনীতে আইনস্টাইন উপস্থিত ছিলেন। চ্যাপলিনের বিশেষ অনুরোধে। অনুষ্ঠানের পর কথা বিনিময় পর্বে , চ্যাপলিন আইনস্টাইনকে জিজ্ঞেস করলেন , " সবাই আমাকে সহজেই বুঝতে পারে, এইজন্যই আমার এতো জনপ্রিয়তা। কিন্তু জনগণ আপনাকে কেন এতো পছন্দ করে, সেটা তো আমি বুঝতে পারিনা। " তখন আইনস্টাইন একটু হেঁসে উত্তর দেন , "আসলে কেউ আমাকে সহজে বুঝতে পারেনা বলেই , আমার এতো জনপ্রিয়তা। "

এবার শোনা যাক, তাঁর ভুলো মনের কয়েকটি উদাহরণ। একবার এক সহকর্মী আইনস্টাইনের কাছে তাঁর ফোন নম্বর জানতে চান। আইনস্টাইন তখন টেলিফোন বইটি (directory) বের করে তাঁর নিজের নম্বরটি খুঁজতে শুরু করেন। তাঁর সহকর্মী অনেকটা অবাক হয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করেন , " আপনার কি নিজের ফোন নম্বরটি ও মনে থাকে না ?" একথা শুনে আইনস্টাইন বলেন, না, তার দরকার ই বা কি? যে জিনিসটা জানার জন্যে আপনার কাছে বই আছে, তা শুধু শুধু মুখস্থ রাখবেন কেন? "

আমেরিকার প্রিন্সটনে অবস্থিত ইনস্টিটিউট অফ অ্যাডভান্সড স্টুডিতে আইনস্টাইন গবেষণা করতেন জীবনের শেষ পর্বে। একদিন সন্ধ্যাবেলায় সেখানকার অধিকর্তার বাড়িতে ফোন আসে , আইনস্টাইনের বাড়ির ঠিকানা জানানোর অনুরোধ নিয়ে। ওই বাড়ির ঠিকানা কাউকে জানানো হয় না বলে অধিকর্তা ফোন রেখে দেন। কিছুক্ষন পরে আবার ফোনটা বেজে

ওঠে এবং ওপর থেকে শোনা গেল, " আমি আইনস্টাইন বলছি,আমার বাড়ীর রাস্তা ও নম্বর কিছুতেই মনে করতে পারছি না। দয়া করে, একটু বলে দিন। "

রেলগাড়িতে ভ্রমণের সময়ে, আইনস্টাইনের দুটি ঘটনা দেখা যাক এবার। একবার রেলগাড়ির ডাইনিং কামরায় রাতের খাবার খেতে বসে দেখেন, তিনি চশমাটা ফেলে রেখে এসেছেন। তার ফলে, খালি চোখে তিনি খাবারের মেনু কার্ডটি পড়তে পারছেন না। তিনি ওয়েট্রেসকে ডেকে বলেন, " দয়া করে মেনু কার্ডটি পড়ে দিন। " ওয়েট্রেস তখন তাঁর দিকে সহানুভূতির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলেন, " দুঃখিত স্যার, আমার পড়াশোনার দৌড়ও আপনার মতোই অতি সামান্য। " আর একবার, আইনস্টাইন ট্রেনে করে কোনো এক গন্তব্যস্থলে যাচ্ছিলেন। টিকিট চেকার যখন তাঁর কাছে টিকিট দেখতে চাইলেন, আইনস্টাইন তাঁর বুক বা প্যান্টের পকেটে অনেক খুঁজেও টিকিটটি পেলেন না। . টিকিট চেকার তখন বলেন, "স্যার, আমি আপনাকে চিনতে পেরেছি।আপনি নিশ্চয়ই টিকিট কেটেই উঠেছেন, আপনাকে আর টিকিট দেখাতে হবেনা।" একথা বলার পরেও, টিকিট চেকার দেখেন আইনস্টাইন তখনও আঁতিপাতি করি টিকিটটা খুঁজে চলেছেন। টিকিট চেকার টিকিটটা না খোঁজার জন্যে তাঁকে বিনীত অনুরোধ করেন। তখন আইনস্টাইন বলেন, " আরে, টিকিটটা না পেলে আমি জানবো কিভাবে, আমাকে কোন স্টেশন এ নামতে হবে। "

আমার ধারণা যে, এই মহাবিশ্বের রহস্যের সমাধান সূত্র খোঁজার প্রক্রিয়াই এই মহান বৈজ্ঞানিকের মস্তিস্কে সর্বদা সচল থাকতো। তাই সামাজিক পরিসরের অনেক মুহূর্তে তাঁর প্রতিক্রিয়া হয়তো স্বাভাবিকতা চ্যুত হতো। এটা একেবারেই অপ্রত্যাশিত নয় সেই মনীষীর কাছে, যিনি ছিলেন যথার্থ অর্থে অতি উচ্চমার্গের এক একনিষ্ঠ বিজ্ঞান তপস্বী।

অঙ্গদানের অঙ্গীকার

প্রতাপ মুখোপাধ্যায়

মহাভারতে দান কে দানধর্ম নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। ধর্ম-অর্থ ধারণার্থ - ব্যক্তিত্বকে ধরে রাখে যে বিবেকচেতনা। যেখানে তপস্যা ও দান কে একই উষ্ণতায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আমার মনে হয় তপস্যার চরম রূপ হলো নিজেকে নিঃশেষ করে যে আত্মনিবেদন অর্থাৎ দানে শুধু নেই কোনো স্বার্থচিন্তার গন্ডীবদ্ধতা। দানের পাঁচটি প্রকারভেদ আছে - ধর্ম কার্যের অঙ্গ হিসাবে দান, প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য দান, ভয়, ইচ্ছা এবং দয়াবশত দান - সব কিছুতেই আছে আত্মগরিমার প্রচার এবং দুর্বল মানুষের স্বর্গলাভজনিত অক্ষয় পুণ্যফল লাভের লিপ্সা। দানের অজস্র উদাহরণ প্রাচীন সাহিত্যে ছড়িয়ে আছে। কর্ণ দানবীর নামে খ্যাত। তিনি তাঁর বাবার দেওয়া রক্ষাকবচ ও কুন্ডল দান করেছিলেন ইন্দ্রকে - প্রতারিত হতে চলেছেন জেনেও। রাজা হরিশ্চন্দ্র বিশ্বামিত্রকে সমগ্র রাজ্য দান করেন এবং তাঁর দক্ষিনা দেবার জন্যে স্ত্রী, পুত্র এবং নিজেকে বিক্রি করে সাত কোটি স্বর্ণমুদ্রা দান করেছিলেন; শেষে অবশ্য চরম দুঃখে সন্তানের চিতায় স্বামী-স্ত্রী দুজনে আত্মবিসর্জনে উদ্যত হলে বিশ্বামিত্র তাঁর উদারতায় মুগ্ধ হয়ে সব কিছু ফিরিয়ে দেন - এখানে দানে আছে মহত্তর উদার্য্য। তবে মানবকল্যাণে নিজের পার্থিব শরীর দানের নজির একজনেরই - তিনি হলেন দধীচি মুনি। মহর্ষি দধীচির আত্মত্যাগের কাহিনী আমাদের দেশে পৌরাণিক আলেখ্যর মর্যাদা পেয়েছে।

আমাদের হয়তো পূর্ণ সচেতনতা এখনও আসেনি নচেৎ ১৪০ কোটি মানুষের দেশে অঙ্গ/ organ/tissue র জন্য সর্বত্রই কেন হাহাকার থাকবে নিরন্তর। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির সঙ্গে brain death ঘটে যাওয়া মানুষের শরীর থেকে অঙ্গ ব্যবচ্ছেদ করে অসুস্থের/রোগীর দেহে তা প্রতিস্থাপন অনেকদিন আগেই শল্য চিকিৎসকগন সমর্থ হয়েছেন - তা ছাড়া মৃত্যুর পর দেহ সংরক্ষন করে চিকিৎসা বিজ্ঞানের কাজে লাগানো - সে ও তো অতি প্রাচীন। ১৯৯৪ সালে ভারত সরকার প্রণীত The Transplantation of Human Organ Act আমাদের এক নতুন দায়িত্ব অর্পণ করেছে। ১৯৯৫ সালে ১৮ই আগস্ট এই আইন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভাতে পেশ হয় এবং গৃহীত হয়। অক্টোবর, ২০০১ এ সরকারী নির্দেশনায় জারি হয়েছিল যে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত মেডিক্যাল কলেজগুলিতে দান করা মরদেহ গ্রহণ ও তার বৈজ্ঞানিক ব্যবহারের জন্য।

আমাদের শরীরে কয়েকটি organ মাত্র একটি করে রয়েছে যা অকেজো হয়ে গেলে জীবনধারণ অসম্ভব হয়ে পড়ে এবং জীবিত অবস্থায় দান করা যায় না যেমন হার্ট, লিভার – এইগুলি কেবল মৃত্যুর পরেই দান করা সম্ভব। কিছু আছে দুটি করে যেমন কিডনি, ওভারি, টেস্টিস – একটি দান করা যেতে পারে জীবন বিপন্ন না করেও। যদি দুটোই খারাপ হয়ে যায় কারোর – সেক্ষেত্রে অন্যের সেই অঙ্গ প্রতিস্থাপন করে রোগীকে বেশ কিছুদিন বাঁচিয়ে রাখা যেতে পারে। এর জন্য দরকার জীবিত বা মৃত (braindeath) দাতা, দাতার প্রকৃতি নির্ণয়, দাতার থেকে নেওয়া organ যতক্ষন না প্রতিস্থাপন হচ্ছে – ততক্ষন বাঁচিয়ে বা কার্যকর রাখা, রোগীর খারাপ হয়ে যাওয়া organ বাদ দেওয়া ও সংস্থাপিত organকে রক্ষা করা। এখন আমাদের আয়ুষ্কাল বেড়েছে – সঙ্গে অসুখও বেড়েছে। এক পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় – কিডনির দরকার

এখন এক লক্ষ বা তার বেশী মানুষের, লিভার প্রতিস্থাপন না হওয়ার ফলে কত মানুষ মৃত্যুর কাছে চলে যাচ্ছেন, কর্নিয়া না পাওয়ার ফলে কত মানুষ দৃষ্টিহীন থেকে যাচ্ছেন।অনুরূপভাবে হার্ট বা ফুসফুসের প্রতিস্থাপনের জন্যও কত মানুষকে আমরা হারাই অকালে।

শুধু যদি কলকাতা শহরের কথাই মনে করি - দেখতে পাবো প্রতিদিন আনুমানিক ২৫০ জন মানুষের অন্ত্যেষ্টি হয়। এর মধ্যে যদি কেবল ১০ শতাংশ অর্থাৎ ২৫ জন মানুষের থেকে ৫০টি চোখ পাওয়া যেত - তা হলে সারা বছরে ৫০ x ৩৬৫ = ১৮২৫০টি চোখ দিয়ে কর্নিয়া জনিত দৃষ্টিহীনতার সমস্যার সমাধান সম্ভব হতে পারতো। আমাদের দেশে NOTO বা National Organ & Tissue Transplantation organisation গঠিত হয়েছে আগে যারা আইনের মাধ্যমে অঙ্গদান ও প্রতিস্থাপনের পুরো প্রক্রিয়াটির সমন্বয়ের কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত।

- একজন অঙ্গদানকারী তাঁর হৃৎপিন্ড, দুটি ফুসফুস, দুটি কিডনি, অগ্ন্যাশয়, অন্ত্র দান করে ৮জন মানুষকে বাঁচাতে পারেন। ঐ ব্যক্তি তাঁর অন্যান্য অঙ্গ(চামড়া, হাড়, কর্নিয়া প্রভৃতি)দান করে আরো ৫০জন মানুষের জীবনে সুস্থতা দান করতে পারেন।
- অঙ্গ প্রতিস্থাপনের জন্য নির্ধারিত হাসপাতাল থেকে দেহ নির্গত অঙ্গগুলিকে নিয়ে যাওয়ার বিশেষ ব্যবস্থাই হল "green corridor" রাস্তায় সমস্ত সিগন্যালগুলিকে গ্রিন রাখা এবং যান চলাচলকে সেই মোতাবেক নিয়ন্ত্রণ করে যত দ্রুত সম্ভব অঙ্গ প্রতিস্থাপনের কাজে সহায়তা করা। বর্তমানে শুধু আমাদের রাজ্যেই নয়, ভিন রাজ্য থেকেও দাতার শরীর থেকে অঙ্গ সংগ্রহ করে গ্রীন করিডরের মাধ্যমে এ রাজ্যে গ্রহীতার শরীরে সফলভাবে প্রতিস্থাপিত হয়েছে।

সারণি ১ : প্রতিস্থাপনের সময়সীমা

ব্রেন ডেথ হয়ে যাওয়া ব্যক্তির দেহ থেকে অঙ্গ নেওয়ার পর একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে তা প্রতিস্থাপিত হওয়া দরকার, না'হলে সংগৃহিত অঙ্গ নষ্ট হয়ে যেতে পারে!

হৃৎপিন্ড -> ৪ ঘন্টা
ফুসফুস -> ৪ - ৬ ঘন্টা
লিভার -> ৬ - ১০ ঘন্টা
অগ্ন্যাশয় -> ১২ - ১৮ ঘন্টা
কিডনি -> ২৮ ঘন্টা

কর্নিয়া, হার্ট ভালভ, চামড়া ও হাড় সংগ্রহ করে জীবাণুমুক্ত করে কলা ব্যাঙ্কে(Tissue Bank) রেখে তা প্রতিস্থাপন করা যায়।

সারণি ২ : যোগাযোগ

টোল ফ্রি নাম্বার : ১৮০০-১১-৪৭৭০

Website : notto.gov.in

email id : dir@notto.we.in

এছাড়া সমগ্র পূর্বাঞ্চলের জন্য :Regional Organ & Tissue Transplantation Organisation (ROTTO)

Office : SSKM হাঁসপাতালের মধ্যে অবস্থিত

Website : www.rotto.in -এ গিয়ে pledge form এ (form - 7) download করে নিয়ে Rotto র ঠিকানায় পাঠিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

এছাড়া স্বাস্থ্যভবন (Sector V Saltlake) এ State Organ & Tissue Transplantation Organisation (SOTTO) র সঙ্গে ও যোগাযোগ করা যেতে পারে।

State Nodal Officer : Dr Tamal Kanti Ghosh

033 - 23576000 (extn - 278)

সারণি ৩ : দানযোগ্য অঙ্গ ও কলা

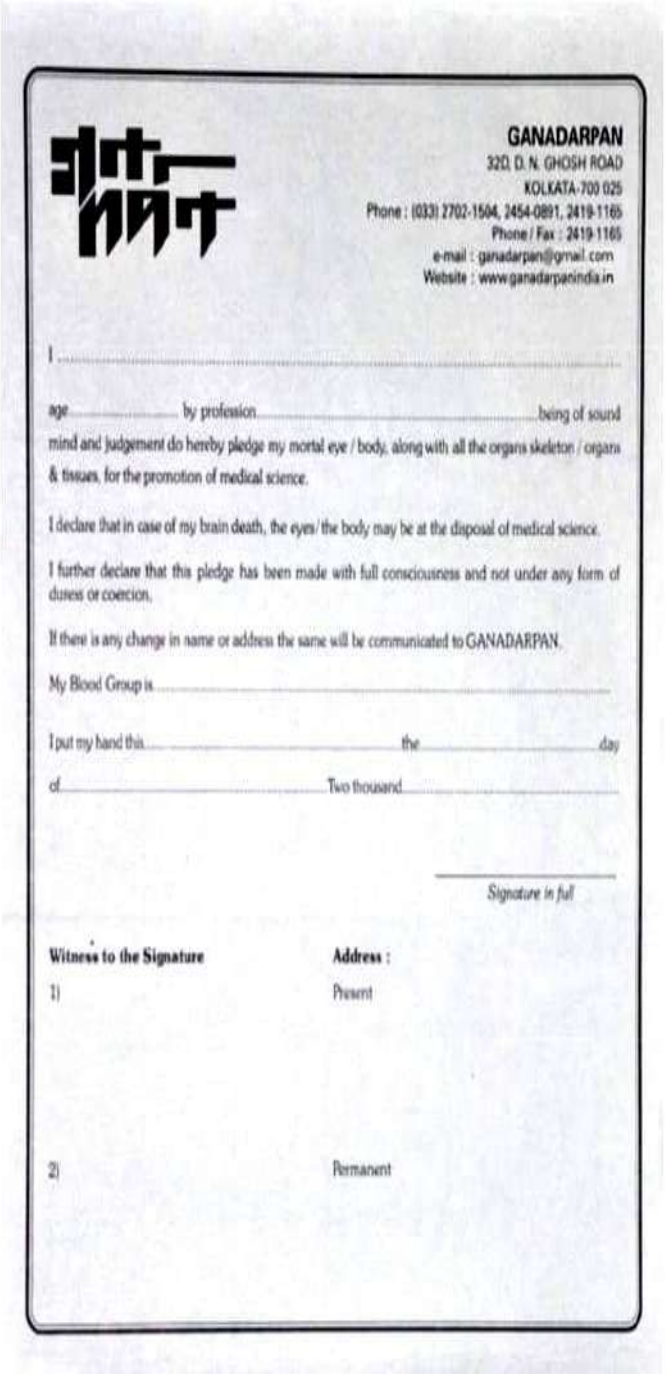

GANADARPAN
320, D. N. GHOSH ROAD
KOLKATA-700 025
Phone : (033) 2702-1504, 2454-0891, 2419-1165
Phone / Fax : 2419-1165
e-mail : ganadarpan@gmail.com
Website : www.ganadarpanindia.in

I .....

age ..... by profession ..... being of sound mind and judgement do hereby pledge my mortal eye / body, along with all the organs skeleton / organs & tissues, for the promotion of medical science.

I declare that in case of my brain death, the eyes / the body may be at the disposal of medical science.

I further declare that this pledge has been made with full consciousness and not under any form of duress or coercion.

If there is any change in name or address the same will be communicated to GANADARPAN.

My Blood Group is .....

I put my hand this ..... the ..... day

of ..... Two thousand .....

.....
Signature in full

Witness to the Signature **Address :**

1) Present

2) Permanent

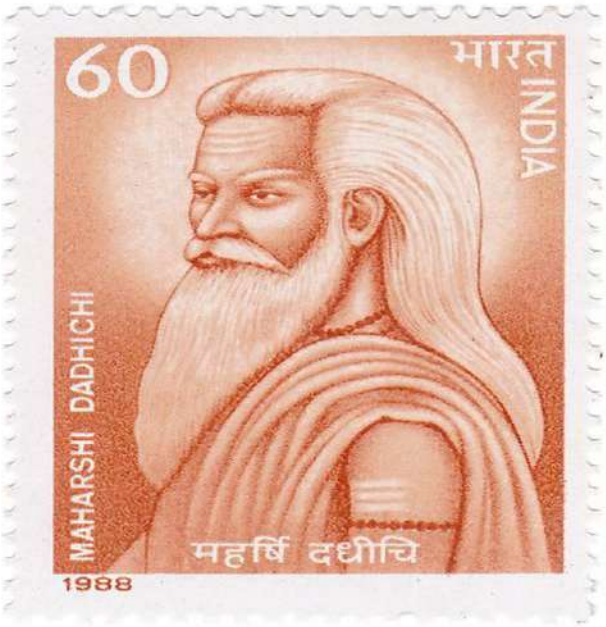

চিত্র ১ :

ভারতীয় ডাক দপ্তরের দেহ দানবীর মহর্ষি দধীচির চিত্রযুক্ত ডাকটিকিট

চিত্র ২:

মহাকাব্যে উল্লেখিত অঙ্গদানের উপাখ্যান ও দানযোগ্য অঙ্গ ও কলাযুক্ত শবদেহের চিত্র

ORGAN DONATION- Awareness

Dr. Pratap Mukhopadhyay
WA: 9038337337

!! গল্প !!

ডেকোনা আমায়

গৌতম রায়

পর্ব - ১

সার্দান এভিনিউ থেকে লেক গার্ডেন্স যাবার উড়ালপুলের রাস্তাটায় একটু এগিয়েই হঠাৎ ছোটো খাটো একটা ভীড় জমে গেল। একদিকের রাস্তায় গাড়ী যাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে সেই ভীড়ের জন্য। গাড়ীগুলো তারস্বরে হর্ন দিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু জনতার যেন কোনো হুঁশ নেই সেদিকে। তারা রাস্তার দিকে আঙ্গুল দিয়ে পরস্পর পরস্পরকে কি যেন বুঝিয়ে চলেছে একমনে । এতো যে গাড়ী দাঁড়িয়ে গেছে পরপর, এতো যে হর্ন দিয়ে যাচ্ছে তারা - তার দিকে কারোর-ই যেন কোনো খেয়াল নেই। ভীড়টা বাড়তে বাড়তে এমন অবস্থায় এসে গেছে যে উল্টো দিকে যাবার রাস্তাটাও আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে যেতে শুরু করেছে।

অনেকক্ষণ গাড়ীতে বসে বসে ভীষণ বিরক্ত লাগছিল গৌরবের। এই ভীড়টার কারণটা কি - সেটা জানতেই গাড়ীর কাঁচ তুলে, দরজা লক করে সেই ভীড়ের দিকে এগুতে শুরু করলো খুব বিরক্ত মনেই। কোনো মানে হয়? এখন সকাল নটাও বাজেনি। এখন থেকেই রাস্তার হাল কেন এমন হলো? আজ ওর গল্ফ গ্রীনে বরুণদের বাড়ী সকাল ৯ টা ১৫র মধ্যে পৌঁছনোর কথা। তারপর ওকে নিয়ে সকাল দশটার মধ্যে যেতে হবে গড়িয়া। খুব দরকারী কাজ। ওখানে যেতে একটু দেরী হয়ে গেলে পুরো কাজটাই নষ্ট হয়ে যাবে। আর হবে না।

ভীড়ের বৃত্তের কাছাকাছি গিয়ে গৌরব দেখলো এক তরুণী, বয়স মনে হয় ত্রিশ - পঁয়ত্রিশের মধ্যে হবে, শুয়ে আছে রাস্তায় আড়াআড়ি ভাবে। পায়ে দামী স্নিকার, ট্র্যাক সুট এবং ফিকে নীল একটা হাফশার্ট পরা মেয়েটা ওর ডানদিকে ফিরে শুয়ে আছে। নীল জামাটা অনেকটা উঠে গিয়ে শরীরের বেশ কিছুটা অনাবৃত করে দিয়েছে। গৌরব বুঝতে পারলোনা - এই সময় মেয়েটা কেন এমন ভাবে রাস্তায় শুয়ে আছে! বেশ ধোপ দুরস্ত সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে বলেই তো মনে হচ্ছে। টকটকে ফর্সা রঙ, কোঁচকানো একঢাল চুল একটা হাতখোঁপা করে বাঁধা। ডান হাতটা শরীরের ভেতর চাপা পড়ে আছে, শুধু কব্জির কাছটা বেরিয়ে আছে। সেখানে দামী কালো ডায়ালের ঘড়ি পরা। - কিন্তু মেয়েটার চোখটা এরকম স্থির কেন? এতো লোক ওকে ঘিরে দাঁড়িয়ে, কিন্তু ওর কোনো দিকে কোনো হুঁশ নেই কেন? ওকি অজ্ঞান হয়ে গেছে? কোনো অসুখ ছিল? মৃগী রোগে এরকম হয় শোনা যায়। এটাও কি তাই? গৌরব পাশের একজনকে জিজ্ঞেস করলো -

– কি হয়েছে ভাই? মেয়েটা এরকমভাবে শুয়ে আছে কেন?

– বলেন কি মশাই? দেখতে পাচ্ছেন না – মেয়েটা গাড়ীতে রানওভার হয়ে গেছে! মাথার পাশ দিয়ে ওই যে রক্তের স্রোত বইছে – দেখতে পাচ্ছেন না? আশ্চর্য মানুষ মশাই আপনি!

গৌরব সত্যিই ওই দিকটা খেয়াল করেনি। লোকটি বলার পর দেখলো মাথার নিচে থেকে কালো রক্তের একটা সরু স্রোত বয়ে চলেছে কালো পিচ রাস্তার ওপর দিয়ে। কালো রাস্তার ওপর কালচে রক্ত দেখতে পায়নি গৌরব।

রাস্তায় এতো ভীড় হয়েছে দেখে সাদার্ন এ্যভিনিউ এর দিক থেকে ছুটে এলো দুজন কনস্টেবল। তারা দুজন-ই রাস্তায় ভীড় নিয়ন্ত্রণ করে উল্টোদিকের রাস্তাটা চালু করে দিল। গাড়ী যেতে শুরু করলো। তারপর কিছু পরে, ওই রাস্তাটা বন্ধ করে দিয়ে এই রাস্তার গাড়ী ওদিকের রাস্তা দিয়ে পার করতে থাকলো। এর মাঝে একটু পরেই এসে গেল একটা অ্যাম্বুল্যান্স । তারা মৃতদেহ নিয়ে চলে গেল সেখান থেকে। অবশ্য,এই 'মৃতদেহ' বলার অধিকার কারোর নেই। এই শরীরে প্রাণ আছে না নেই সেটা বলার অধিকার আছে কোনো ডাক্তারের। ওরা কোনো হাসপাতালে নিয়ে গেল দেহটাকে।

রাস্তায় ভীড় করে থাকা জনগন আস্তে আস্তে ফাঁকা হতে শুরু করলো। কিন্তু তাদের অভিজ্ঞতায় এবং দুজন প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা অনুযায়ী যা জানা গেল একটা বড়ো গাড়ীর তলায় চাপা পড়েছে মেয়েটা বড়োজোর আধঘন্টা আগে। ও যখন রাস্তা পেরিয়ে তিন নম্বর গেটের দিকে যাচ্ছিল তখনই আচমকা গাড়ীটা প্রায় উড়ে এসে ওকে ধাক্কা মারে। গাড়ীটা নিয়ে বোধহয় কেউ চালানো শিখছিল, কারণ গাড়ীটা মেয়েটার সামনা সামনি এসে হঠাৎ যেন ভীষণ জোরে চলতে শুরু করে। তারমানে নির্ঘাত ব্রেক করতে গিয়ে ভুল করে অ্যাকসিলেটারে চাপ দিয়ে ফেলেছে।

কিছু তদন্ত প্রিয় মানুষ তাদের স্থির সিদ্ধান্ত জানাল। মেয়েটি যখন গেটের দিকে যাচ্ছিল, তখন নিশ্চয়ই ও লেক গার্ডেন্সের এই কাছাকাছি কোথাও থাকে। সকালে মর্নিং ওয়াক করতে এসেছিল লেকে, তারপর বাড়ী ফিরছিল বেচারা! কে জানে কাদের বাড়ীর মেয়ে ও! এই একটা অসুবিধা শহরের মানুষদের। পাশের বাড়ীর লোককেও কেউ চেনে না! আলাপ নেই। যে যার নিজের মতো থাকে! এবার বাড়ীর লোক জানবে কি করে ওর খবর? সকালে মর্নিং ওয়াক করার সময়মতো কেউ আধার কার্ড নিয়ে বা কোনো পরিচয় পত্র নিয়ে আসে না। এবার কি হবে? কি করে খোঁজ পাবে বাড়ীর লোকজন? মেয়েটার কানে তো হেডফোন-ও ছিল না। তারমানে হয়তো ফোনটাও নিয়ে বেরোয়নি বাড়ী থেকে। বেশীরভাগ এখনকার ছেলে মেয়ে, যারা মর্নিং ওয়াক করে, তারা পকেটে ফোন রেখে গান চালিয়ে রাখে আর কানে গোঁজা থাকে হেডফোন। এর তো মনে হয় ফোনও ছিল না সাথে। তাহলে কি করে এর বাড়ীর লোককে খুঁজে পাওয়া যাবে? কি করেই বা খবর পাবে তারা? তার চেয়েও বড়ো কথা – মেয়েটা কি আদৌ বেঁচে আছে এখনও? খুব বেশীতো দেরী হয়ে যায়নি মনে হয়! তাহলে? এরকম একটা মিষ্টি, কম বয়সের মেয়ে এরকম হঠাৎ মারা যাবে? এ সত্যিই ভাবা যায় না। কার যে কপালে কি থাকে, কিছুই বোঝা যায় না। এক মুহূর্ত আগেও জানা যায় না – কি হতে চলেছে তার পরমুহূর্তেই! কি অনিত্য এ জীবন! তবুও আমরা সব সময়ে আমার আমার করে চলি!

পর্ব – ২

বারবার ঘড়ি দেখে চলেছে উদয়ন। আজ হলোটা কি প্রিয়ার? প্রত্যেকদিন তো ও সকাল সাড়ে ছটা – সাতটার মধ্যে ঘুম থেকে উঠে বাবলুকে ঘুম থেকে তুলে ওকে স্কুলে যাবার জন্যে রেডি করে। তারমধ্যে বাবলুর ব্রেকফাস্ট রেডি করে খাইয়ে সকাল আটটার মধ্যেই ওকে স্কুলের বাসে তুলে দেয়। তারপর গ্যাসে ভাতটা বসিয়ে, গ্যাসটা কমিয়ে দিয়ে লেকে যায় একচক্কর হেঁটে আসতে। আগে অবশ্য ওর এই রোজ মর্নিং ওয়াকের ব্যাপারটা ছিলোনা। কিন্তু এখন একটু ব্লাড সুগারের লক্ষণ দেখা দেওয়ায় ডাক্তার বলেছেন – এখনই আমি এই ব্যাপারে কোনো ওষুধ দিতে রাজী নই। মর্নিং ওয়াক করো অন্ততঃ আধঘন্টার মতো, এমনিতেই সুগারের লেভেল ঠিক হয়ে যাবে। তারপর থেকেই ও বাবলুকে রেডী করে স্কুল বাসে তুলে দিয়ে ভাতটা গ্যাসে বসিয়ে একবার বেরিয়ে পড়ে, তাড়াতাড়ি হেঁটে লেকে একটা পাক দিয়ে চলে আসে। তারপর বাড়ী ফিরে দু – একটা আইটেম রান্না করে উদয়ন কে ভাত বেড়ে দেয়। ওকে সাড়ে নটার মধ্যে বেরুতে হয়। তারপর ও নিজের স্কুলে যাবার প্রস্তুতি নেয়।

ওদের বাড়ীটা লেক গার্ডেন্স এর তিন নং রেল গেট পেরিয়েই পড়ে। ওখান থেকে হেঁটে রেল গেটটা পেরিয়ে লম্বা লম্বা পায়ে লেকটাকে একচক্কর হেঁটে এসে ও সময়মতোই তো চলে আসে। কিন্তু আজ কি হলো ওর? দশটা বেজে গেল এখনও মেয়েটা বাড়ী ফিরলো না! এদিকে উদয়নের আজই অফিসে বোর্ড মিটিং আছে। সকাল এগারোটা থেকে। তাই যেতেই হবে সেখানে। প্রিয়ার জন্যে আর কতক্ষনই বা অপেক্ষা করবে ও? একটু চিন্তা ভাবনা করেনা, একটু সময় মতো তো আসতে হবে, তাই না? হাঁটা তো খুবই ভালো। কিন্তু অন্যান্য দায় দায়িত্ব তো ঠিকমতো সামলাতে হবে, তাই না? যদিও রোজই ও নিয়মকরে সব কাজই একেবারে নিখুঁত ভাবে করে, কিন্তু আজই বা সেটা করবে না কেন? দেখোগে, হয়তো কোনো পুরোনো বন্ধু বা পরিচিতের সাথে দেখা হয়ে গেছে, গল্প করতে করতে বাড়ী ফেরার কথা হয়তো মনেই নেই। উদয়ন যে অফিসে যাবে, তার হয়তো কোনো খেয়ালই নেই।

বেশ কয়েকবার ফোন করেছে এরমধ্যে উদয়ন, কিন্তু সে ফোন বেজেই যাচ্ছে। কেউ তুলছে না। কিন্তু আর তো উদয়ন অপেক্ষা করতে পারবে না। ওকে তো বেরুতেই হবে এবার। নয়তো ওই দরকারী বোর্ড মিটিং টা ওর মিস্ হয়ে যাবে। আর এসব ব্যাপারে কোনো কথাই শুনতে চাইবে না ম্যানেজমেন্ট।বলা যায় না, এই একটা বোর্ড মিটিং মিস্ হয়ে যাবার কারণেই হয়তো ওর এখানকার অফিসের পোস্টিং টাই চলে যেতে পারে। আর তখন তো ঘোর বিপদে পড়বে উদয়ন। বউ এর চাকরি এখানে, ছেলের স্কুল এখানে, কাজকর্ম, আত্মীয় স্বজন – সব এখানে। ভগবান না করুন, যদি সেরকম কোনো দিন দুর্ভাগ্যক্রমে এসেও যায়, তাহলে এখানকার এই সবকিছু ফেলে রেখে উদয়নকে কোনো গণ্ডগ্রামে একা থাকতে হবে, নিজের হাত পুড়িয়ে রান্না, খাওয়াও একা একা করতে হবে। ধুসস্ ! এ অসম্ভব! তার চেয়ে দেখি – যদি কিছু ফ্রীজে রান্না থেকে থাকে। যা পাওয়া যাবে, তাই ই একটু খেয়ে নিয়ে অফিস ছুটতে হবে!

সে না হয় হলো, কিন্তু প্রিয়া কি ফ্ল্যাটের ডুপ্লিকেট চাবিটা নিয়ে গেছে? ওর যা ভুলো মন, চাবি যদি না নিয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে তো ও ফ্ল্যাটে ঢুকতেই পারবে না। তাহলে কি হবে? ও স্কুল যাবে কি করে? বাবলু ফিরে এলে কি হবে? – কিছুই মাথায় ঢুকছে না! কি যে করি! একটা কাজ করলে হয় না? নিচের সিকিউরিটির কাছে চাবিটা রেখে গেলে তো হয়! খুব কি রিস্ক হবে তাতে? রিস্ক একটু হয়তো থাকবে, কিন্তু এছাড়া তো কিছুই করার নেই ওর! ফোনটাও তো একবার ধরছে না! যদি একবার ফোন পাওয়া যেতো,

পুরো ব্যাপারটা বুঝে, নিশ্চিন্ত হয়ে বেরুনো যেত! একদিন না হয় বাইরের কোনো পাইস হোটেলেই খেয়ে নেবে ও! কি মুশকিল হলো এবার!

আর অপেক্ষা করা যাবে না। এবার রেডি হয়ে বেরুতেই হবে। উদয়ন অফিসে যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে নেয়। তারপর ফ্রীজটা খুলতে গিয়ে দেখে প্রিয়া ফোনটা ফ্রীজের মাথায় রেখে গেছে। ভালো করে ওর ফোনটা দেখলো উদয়ন। ফোনে সাউন্ড টা অফ্ করা। রাতে ফোনে মেসেজ এলে টুং টাং করে শব্দ হয়ে উঠলে বাবলুর ঘুম ভেঙে যায়। তাই ও ফোনের সাউন্ড টা রাতে শুতে যাবার সময়ে অফ করে দেয়। সকালে উঠে সেটা অন করতেও ভুলে গেছে। তাছাড়া ফোনটা নিয়েও যায়নি আজ!

মুশকিল হচ্ছে , এই সকালটা প্রিয়া এতোই তাড়াহুড়ো করে সব কাজ করে - যে সত্যিই ভাবা যায় না। ঘুম থেকে ওঠার ঘন্টা চারেকের মধ্যে ও যেন দু - হাতে সব কাজ সেরে হাঁটা হাঁটি সেরে, রান্না বান্না শেষ করে খাওয়া দাওয়ার পাঠ মিটিয়ে স্কুলে যায়! পারেও বটে মেয়েটা! দোষের মধ্যেও একটু ভুলো মেয়ে। তা - এতো কাজের মাঝে দু - একটা ব্যাপার ভুলে যাওয়া একটুও অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। আজ যেমন, ফোনটা নিয়ে বেরুতেই ভুলে গেছে। শুধু তাই নয়, সাউন্ড টা অন করতেও মনে ছিল না। উদয়ন এতক্ষণ বৃথাই চেষ্টা করলো, বারবার ফোন করলো!

ঘড়িটা দেখে চমকে উঠলো উদয়ন! আর একমিনিট - ও অপেক্ষা করা যাবে না। এখুনি বেরিয়ে পড়তেই হবে।

একটা উৎকট গন্ধ অনেকক্ষণ থেকেই আসছিল। এখন সেটা যেন একটা অসহ্য অবস্থায় চলে এসেছে। কোথা থেকে আসছে গন্ধটা? পাশের কোনো বাড়ী থেকে আসছে? না কি ওদের ই রান্না ঘর থেকে আসছে গন্ধটা?

তাড়াতাড়ি কিচেনে গিয়ে উদয়ন দেখলো - যা - ভয় পাচ্ছিল - ঠিক তাই হয়েছে। গ্যাসে যে ভাত বসানো ছিল - সেটা পুড়ে কালো হয়ে গেছে। এমনকি ওই হাঁড়িটা অবধি পুড়ে কালো হয়ে গেছে। কী কাণ্ড! এটা না দেখে উদয়ন বেরিয়ে পড়লে - কি যে আজ হতো কে জানে!

খুব ছুটতে ছুটতে অফিস পৌঁছে বোর্ড মিটিং রুমে ঢুকতেও বেশ দেরী হয়ে গেল। ও ঘরে ঢোকার সময়ে দরজা খোলার শব্দে সবাই একবার ওর দিকে তাকালো। ম্যানেজারের চোখে একটা নীরব ভর্ৎসনার ছাপ দেখতে পেল ও। উদয়নও মুখে ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গী করে নিজের সিটে গিয়ে বসে পড়লো। মিটিং চলতে লাগলো নিজের ছন্দে।

আজ উদয়ন কিছুতেই এই মিটিং এ মন বসাতে পারছে না। বারবার ঘুরে ফিরে প্রিয়ার বাড়ী না ফেরার ব্যাপারটা মাথায় আসছে। চিন্তা হচ্ছে। হঠাৎ এখন ওর মনে হচ্ছে - ওর কোনো বিপদ আপদ হয়নি তো? সত্যিই তো! এই কথাটা তো একবারও মাথায় আসেনি ওর! প্রিয়ার পক্ষে ভালো থাকাটা এবং একই রুটিনে থাকাটা এমনই অভ্যাসের মধ্যে এসে গেছে যে এতক্ষণের এই কথাটা সত্যিই মাথায় আসেনি ওর! এখন এই অপেক্ষার কথাটা মাথায় আসতেই চঞ্চল হয়ে উঠলো উদয়নের মনটা। এই দুশ্চিন্তাটা মনের মধ্যে পুরো ছেয়ে গেল। বুকের মধ্যে একটা কিরকম যেন চিন্ চিন্ করে উঠলো। উদয়ন চুপচাপ বসে থাকতে পারলো না। টয়লেটে গিয়ে একবার ফোন করলো প্রিয়াকে। কিন্তু না, ফোনটা সেই আগের মতোই বেজে গেল। কেউ ধরলো না!

এবার বেশ ভয় ভয় করতে লাগলো উদয়নের। প্রিয়া তো এতোটা irresponsible একেবারেই নয়। সংসারের ব্যাপারে উদয়ন চিরকালই একটু উদাসীন। কিন্তু প্রিয়াকে ওর কোনো শত্রুতেও এই অপবাদটা দিতে পারবে না। আসলে ওর মনের সবকিছু চিন্তা ভাবনা শুধু ওর স্বামী আর ছেলেকে নিয়েই আবর্তিত হয়। ওর নিজের সংসার ছাড়া ওর আর কোনো চিন্তা ভাবনাই নেই। ওর বর আর ছেলে ভালো থাকলেই ওর ভালো থাকা হয়ে যায়। আর প্রিয়া নিজে সংসারের সব দায়িত্ব একা নিজের হাতে সামলায় বলে উদয়ন – ও কোনো চেষ্টা করেনি বা প্রয়োজন অনুভব করেনি সংসারের এমনকি বাবলুর ব্যাপারেও মাথা ঘামানোর। আর যদিও বাবলুর স্কুলের বা অন্য কোনো দরকারে দু – একবার মাথা ঘামাতে হয়েছে, প্রিয়ার ব্যাপারে কোনো দিনই দরকার হয়নি তার। উদয়ন এই সকালে অফিস বেরিয়ে যায়, বেশ রাত হয়ে যায় ফিরতে। প্রাইভেট কোম্পানি, কাজের কোনো মাথা মুন্ডু নেই, অফিস ছুটিরও কোনো নির্দিষ্ট সময় নেই। কোনোদিন সন্ধ্যে ছটার মধ্যে বেরিয়ে পড়া যায়, আবার কোনোদিন অফিস থেকে বেরুতে বেরুতে রাত সাড়ে নটা, দশটাও হয়ে যায়। বাবলু যখন রেডী হয়ে স্কুলে যাবার সময়ে টা – টা করে, উদয়ন তখন সবেমাত্র ঘুম থেকে ওঠে, আবার বেশীরভাগ দিন ও যখন বাড়ী ফেরে, তখন বাবলু ঘুমিয়ে পড়ে। আর যেদিন অফিস থেকে তাড়াতাড়ি বেরুতে পারে, বন্ধু দ্বৈপায়নের সাথে রাখী বার এ বসে দু-পাওর খেয়ে আসে। আর কী আশ্চর্য্য, সেরকম দিনে দরজায় কলিংবেল বাজানোর সময় থেকেই যেন প্রিয়া সব বুঝে যায়। দরজা খুলে বেশ রাগত চোখে উদয়নের দিকে তাকিয়ে শুধু চোখের ভাষায় বুঝিয়ে দেয় – এই অবস্থায় তুমি মোটেই বাবলুর কাছে যাবে না। তুমি এখন মাতাল। ছিঃ ! লজ্জা করে না? বাচ্চা ছেলেটা কি শিখবে তার বাবার থেকে?

এক একদিন প্রিয়া বেশ রাগারাগি করে, দু – চার কথা বলে দেয়! যেদিন একটু তাড়াতাড়ি ছুটি হয়, সেদিন তো একটু বাড়ী ফিরে বাবলুকে পড়াতে বসতে পারো? নিদেনপক্ষে একটু দরকারী দোকান বাজারও তো করতে পারো! তোমার অবস্থা দেখে তো আমি নিজেই তো সমস্ত কাজ করি, দেখতে পাওনা? আমারও তো একটু ইচ্ছে হয় Relax করতে, ইচ্ছে তো হয় – তুমি অন্ততঃ একটু খানি আমার মুখের দিকে চাইবে, ছেলেটার দিকে তাকাবে! কোনোদিনই তো কিছু করতে দিই না তোমায়, আমার যতো কষ্ট হোক না কেন – সব নিজে হাতে করি। তোমার একদিনও মনে হয় না যে আমি কি খেলাম, কি করলাম বা আমি ভালো আছি কিনা – জানতে? আমার মনের কথা তো কোনোদিনই বুঝতে পারোনি তুমি, বোঝার কোনো চেষ্টাই করোনি। কিন্তু তুমি তো একজন মানুষ, একদিন আমায় ভালোবেসে বিয়ে করেছিলে। তখন তো মিষ্টি মিষ্টি কতো কথাই তো বলতে! এখন সেসব কথা মনে পড়েনা একেবারেই? আশ্চর্য্য! এখন তুমি একটা অমানুষ হয়ে গেছ! বাড়ীতে যে দুটো মানুষ তোমার অপেক্ষায় সারাদিন থাকে, তাদের কথা একবারও কি মনে পড়েনা তোমার?

আর গত রাতেও তো একই কান্ড হয়েছিল। কাল সাতটার আগেই অফিস থেকে ছাড়া পেয়েছিলাম, আর তারপর দ্বৈপায়ন আর নীলাদ্রি বললো – বারে যাবে। আমিও গেলাম। কাল নেশাটা অনেকটাই বেশীই হয়ে গিয়েছিল, বাড়ী ফিরতেও বেশ রাত হয়ে গিয়েছিল। রাত প্রায় সাড়ে এগারোটা হয়ে গিয়েছিল। আর বাড়ী ফেরার পরেই প্রিয়ার কি তর্জন গর্জন! কাল তো সহ্য করা যাচ্ছিল না। নেশার ঘোরে প্রিয়াকে এক ধাক্কায় ঠেলে ফেলে দিয়েছিলাম। না, না, ঠেলে দিয়েছিলাম ঠিকই, কিন্তু ওইভাবে ফেলে দিতে আমি সত্যিই চাইনি। কিন্তু কি জানি, কেন ওরকম ভাবে ও কাল পড়ে গেল। খাটের একটা পায়া খুব জোরে ওর কপালে লেগে গিয়েছিল। আর আশ্চর্যের ব্যপার, বাড়ী ফেরার পর থেকে এতো যে ঘ্যাজর ঘ্যাজর করে যাচ্ছিল, পড়ে যাবার পরে কিন্তু একবার আর্তনাদ করে উঠে একেবারে চুপ করে গিয়েছিল। শুধু ওর চোখ থেকে তখন

একই সঙ্গে রাগ আর ঘৃণার একটা তীব্র দহন বেরিয়ে আসছিল। আমি একেবারেই সেটা সহ্য করতে পারছিলাম না। খুব ইচ্ছে করছিল ওর কাছে গিয়ে একবার ক্ষমা চাই, বলি – sorry প্রিয়া, extremely sorry! আমি এতো জোরে তোমায় ধাক্কা মারতে চাইনি গো। তোমায় শুধু একটু চুপ করাতে চাইছিলাম। সারাদিনের পর বাড়ী ফিরে কারোর কি ভালো লাগে বউ এর থেকে এতো কড়া কড়া কথা শুনতে? প্রিয়া, লক্ষীটি; রাগ কোরোনা, ক্ষমা করো আমায়।

আমি অবশ্য Sure নই – সেসব কথা তোমায় ঠিক মতো বলতে পেরেছিলাম কি না? বলার খুব চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু নেশায় চোখ একদম জড়িয়ে আসছিল তখন! তাই আমি ঠিক জানি না যে সেগুলো তোমায় বলে উঠতে পেরেছিলাম কিনা? – কি জানি হয়ত, মনে মনেই বলেছি সেসব।

মনের মধ্যে আবার একটা সম্ভাবনার কথা মাথায় বিদ্যুতের মতো খেলে গেল উদয়নের। আচ্ছা, প্রিয়া গত রাতের ঘটনার জন্য অভিমানে কিছু একটা করে ফেলেনি তো? বলা যায় না কিছুই! ও যে ভীষণ অভিমানী মেয়ে! ওর অভিমান সাংঘাতিক! আগে অনেকবারই তো ওর অভিমানের পরিচয় পেয়েছিলাম। আর তাছাড়া – ওর সঙ্গে রাগারাগি, কথা কাটাকাটি হয়েছে মাঝে মাঝেই, কিন্তু এই ধাক্কা ধাক্কির মতো কোনো ঘটনা বা শারীরিক আঘাতের মতো কিছু তো কোনোদিনও হয়নি। তাই এবারের অভিমান মাত্রা ছাড়া হয়ে যেতেই পারে। তাহলে কি সেই অভিমানে এই ভোরবেলায় নিজেকে শেষ করে ফেলার মতো কিছু করে ফেললো? এরকম কি হতে পারে? খুবই কি অস্বাভাবিক ব্যাপার এটা?

মনের আরেকটা অংশ বলে ওঠে তখুনি – না, না, প্রিয়া এরকম কাজ কিছুতেই করতে পারে না! বাবলুকে ছেড়ে ও কিছুতেই চলে যেতে পারে না। বাবলুকে যে ও নিজের থেকেও অনেক বেশী ভালোবাসে। ও চলে গেলে – বাবলুর কি হবে?

সবই তো ঠিক! কিন্তু ও তাহলে গেল কোথায়? কি হতে পারে ওর?

পর্ব – ৩

কিভাবে যে গত তিনটে দিন কেটে গেল – উদয়নের যেন এখনও ঠিক মতো তা মাথায় আসছে না। এখনও ও ভেবে পাচ্ছে না – যা হয়ে চলেছে, যা হয়ে গেল – সবই কি সত্যি? না – কি এখনও ও কোনো একটা দুঃস্বপ্ন দেখে চলেছে! সেদিন অফিসের মিটিং – লাঞ্চ ব্রেক হবার সময়েও ও বার বার প্রিয়ার ফোনে ফোন করে গেছে। কিন্তু সেগুলো সবই একই রকম ভাবে বেজে গেছে। মনটা তখন-ই একটু কু-ডেকে উঠেছিল উদয়নের। এতো দেরী তো প্রিয়া কিছুতেই করতে পারে না। এতো নিশ্চয়ই কোনো একটা অঘটন ঘটেছে কিছু! তাছাড়া এখনও যদি প্রিয়া না ফিরে থাকে – বাবলু একটু পরেই স্কুল থেকে বাড়ী ফিরে আসবে। তখন কি হবে? ও কোথায় যাবে? সিকিউরিটির কাছে ও ফ্ল্যাটের চাবি দিয়ে এসেছে – সেটা ঠিক। কিন্তু ওইটুকু বাচ্চা কে ওরা চাবি দেবে কেন? অথবা ওরা যদি ওকে দরজা খুলেও দিয়ে থাকে, ওইটুকু ছেলে একা ঘরে গিয়ে করবে টা কি? কি খাবে? কি করবে?

আর ভাবতে পারছিল না উদয়ন। জাহান্নামে যাক চাকরী। মরিয়া হয়ে ম্যানেজারকে বলে লাঞ্চ না করেই ফিরে গেছে বাড়ীতে। ও পৌঁছোনোর কিছু সময় পরেই স্কুল থেকে বাবলু ফিরে আসে। ওর জন্যে ওর প্রিয়

মিষ্টি আর চকোলেট কিনে নিয়ে এসেছিল উদয়ন। সেগুলো ওকে খাইয়ে দিয়ে পাশের ফ্ল্যাটের মিসেস সিনহার কাছে বাবলুকে জমা দিয়ে পড়িমরি করে ছোটে থানায়। সেখানে প্রিয়ার সকালের পর থেকে অদৃশ্য হবার ঘটনা বলে Missing Diary করানোর সময়ে সেই পুলিশ অফিসার প্রিয়ার চেহারার বর্ণনা, শেষ যখন ওকে দেখা গেছে – সেই সময়ের পোশাকের বর্ণনা এবং ওর মর্নিং ওয়াকে যাওয়ার সময় এবং হাঁটবার রুট ভালো করে জেনে নিয়ে খুবই চিন্তান্বিত অবস্থায় জানতে চান – প্রিয়ার কোনো ছবি দেখাতে পারে কি না! উদয়ন মোবাইলে প্রিয়ার ছবি দেখানোর পর সেই পুলিশ অফিসার উদয়ন কে জানান যে আজ সকালেই লেকের তিন নম্বর গেটের কাছে গাড়ীর ধাক্কায় এক ভদ্রমহিলা Spot Dead হয়ে গেছেন। আপনার বর্ণনা শুনে সেই মৃতদেহের সঙ্গে সব মিলে যাচ্ছে। সেই ভদ্রমহিলা যদি আপনার স্ত্রী হন, তাহলে আমরা খুবই দুঃখিত। তিনি আর নেই। আর তিনি যদি আপনার স্ত্রী না হন – তো তারপর আমরা investigation করে দেখবো। আপাতত আপনি বাঙ্গুর হসপিটালের মর্গে যান, মৃতদেহ identify করে আসুন। আমি দরকারী কাগজপত্র সব করে দিচ্ছি।

মাথাটা হঠাৎ পুরো ঘুরে গিয়েছিল উদয়নের। হঠাৎ যেন সারা পৃথিবী দুলে উঠেছিল ওর পায়ের তলা থেকে।

কানের কাছে হটাৎ একটা অদ্ভুত শব্দ হতে শুরু করেছিল যার জন্যে সেই মুহূর্তে পৃথিবীর তখন আর অন্য কোনো শব্দই কানে ঢুকছিল না ওর। মনে মনে ও শুধু বলে চলেছিল – প্রিয়া, তুমি আমায় ছেড়ে, বাবলুকে ছেড়ে চলে গেলে? না, না, এ হতে পারে না। এ নিশ্চয়ই অন্য কেউ। তুমি নিশ্চয়ই অন্য কোথাও আছো এখন ভালো আছো। হয়তো আমার ওপর অভিমান করে কোথাও চলে গেছো। না প্রিয়া, তুমি যেও না প্রিয়া, প্রিয়া আমার, প্লীজ তুমি যেন আমাদের ছেড়ে চলে যেও না।

– এ কী আপনার কী শরীর খারাপ লাগছে? জল খাবেন? একটু জল খান।

সেই পুলিশ অফিসারের কথায় আবার এই বাস্তবের মাটিতে ফিরে আসে উদয়ন । পুলিশ অফিসার ওর হাতে কাগজপত্র দিলেন। তারপর ওর অবস্থা দেখে একজন কনস্টেবল কে সাথে পাঠালেন। সঙ্গে পাঠালেন পুলিশ ভ্যান।

মৃতদেহ identify করে এবং তারপর সব নিয়মকানুন মতো সব কাজ শেষ করতে প্রায় সন্ধ্যে হয়ে গেল। উদয়নের নিজেকে হঠাৎ খুব নিঃসঙ্গ লাগছিল। আশ্চর্য্য একটা অদ্ভুত জীবন ওদের। উদয়নের এবং প্রিয়ার কারোর কোনো আত্মীয় স্বজন হয় এখন বেঁচে নেই আর নয়ত কোনোদিনও ছিলোনা। এরকম একটা বিপদের দিনে ও সম্পূর্ণ একা। এমনকি ওদের ওইটুকু এবং একমাত্র ছেলেটাকেও দেখার কেউ নেই এই মুহূর্তে। মিসেস সিনহা হয়তো ওকে এখন ঠিকই দেখবেন, খাওয়াবেন বা অন্য সব কিছুই করবেন, কিন্তু সেটা কতক্ষনের জন্য? বা কতোদিনের জন্য? তারপর কে ওকে দেখবে? ও কোথায় যাবে? কার কাছে থাকবে? কার কাছে আদর যত্ন পাবে, পড়াশুনা করবে? উদয়ন তো কোনোদিনই বাবলুর জন্যে কোনোরকম সময় দেয়নি। কাজের চাপ ছিল, এটা সত্যি কথা হলেও পুরোটা সত্যি তো নয়। ওর বন্ধু বান্ধবের সাথে মেলামেশা, খাওয়া – দাওয়া সবই করে গেছে নিয়মিত। এই সময়টা হয়ত বাবলুর সঙ্গেই কাটাতে পারতো উদয়ন, কিন্তু করেনি। প্রিয়া তার নিজের সমস্ত শখ, সাধ বিসর্জন দিয়ে বলতে গেলে একেবারে একা হাতে বাবলুকে এতোটা বড়ো করে তুলেছে। এরপর কি হবে? ওইটুকু মা – হারা ছেলেকে কে দেখবে? তাছাড়া প্রিয়ার মতো যদি উদয়নকেও একইরকম ভাবে হঠাৎ চলে যেতে হয় কোনোদিন, তাহলে ছেলেটা কি করবে? একেবারে অনাথ

হয়ে যাবে তো ও! ইস্ প্রিয়া, তুমি কেন চলে গেলে এভাবে? এ কি শাস্তি তুমি দিয়ে গেলে আমাকে? বাবলুকে? আমি জানি – তুমি কাল রাতে আমার ব্যবহারের জন্যই ভীষণ কষ্ট পেয়েছিলে। আর সেই অভিমানেই তোমার এমন মন খারাপ ছিল, অন্যমনস্ক ছিলে – অতো জোরে গাড়িটা যে আসছে – তুমি রাস্তা পেরোনোর সময় সেসব খেয়ালই করোনি। কেন প্রিয়া, কেন? কেন তুমি এরকম করলে? আমার একটা অনিচ্ছাকৃত দুর্ব্যবহারের জন্য আমায়, বাবলুকে এতোটা শাস্তি তুমি দিতে পারলে? জানো প্রিয়া, তোমার মুখটার থেকে সাদা কাপড় সরিয়ে যখন হাসপাতালে তোমাকে চেনার জন্য দেখালো – সত্যি বলছি, তোমায় দেখে মনে হচ্ছিল – যেন তুমি সারারাত কাঁদতে কাঁদতে সকালের দিকে একটুখানি ঘুমিয়ে পড়েছো। কি বললে? কি করে বুঝলাম? তোমায় আমি ভীষণ ভালোবাসি প্রিয়া, তুমি জানোনা। তুমি যখনই কোনো ব্যাপারে অভিমান করে থাকো বা কাঁদো, আমি দেখেছি তোমার চোখ দুটো একটুতেই কিরকম ফুলে যায়। চোখের কোনে হটাৎ কেমন কালি পড়ে যায়। চোখের তলায় জলের শুকিয়ে যাওয়া দাগ দেখা যায়।

আমি তোমায় বেশ কয়েকবারই দেখেছি এরকমভাবে। কিন্তু সেই সময়ে আমি তোমার কাছে আমার রাগ দেখানোটা চালিয়েই গেছি – সেই রাগের যাতে না কোনো ভাবে গুরুত্ব কমে যায়। কিন্তু মনে মনে ভীষণ কষ্ট পেতাম গো প্রিয়া তখন আমি। বিশ্বাস করি তুমি, তোমার চোখে জল দেখলে আমিও কাঁদতাম। কিন্তু সেই কান্নাটা হতো ভেতর ভেতর। ছেলেদের যে চোখের জল ফেলে কাঁদতে নেই। মনে মনে রক্তক্ষরণটা কিন্তু ঠিক হয়েই যেত। আবার তুমি যখন সেই আগের মতো প্রজাপতি হয়ে উড়তে আমার কাছাকাছি, তোমার চোখের মণি হাসতো, নেচে উঠতো, কী যে ভালো লাগতো, আনন্দ হতো – তুমি ভাবতে পারবে না গো। এটা ঠিক, আমার সেই মুগ্ধতা তোমায় অতোটা বুঝতে দিতাম না, কিন্তু আনন্দের একটা ঝর্ণাধারা তখন বয়ে যেত আমার মনের ভেতর। অবশ্য বিয়ের দু – তিন বছর পর থেকে আর তোমার সেই হাসিখুশি চেহারাটা খুব একটা দেখতে পাইনি। Infact, খুব দরকার ছাড়া তো তুমি আমার সঙ্গে খুব একটা কথাও বলতে না। তোমার তখন যতো কথা, যতো আনন্দ, যতো হাসি, গান – এসবই ছিল বাবলুর সঙ্গে। ওইটুকু ছেলে কি বুঝতো সেসব? আর আমি যে কাঙালের মতো সেসব চাইতাম তোমার থেকে মনে মনে, তুমি সেসব একটুও বুঝতে পারতে না। না, ভুল বললাম, বলা ভালো – বুঝতে চেষ্টাই করতে না। আমি তখন মোটামুটি অপাংক্তেয় হয়ে গিয়েছিলাম তোমার কাছে। তোমার যেটুকু দায়িত্ব ছিল আমার প্রতি, নিষ্ঠা ভরেই করে গেছে সবটা। শুধু আমার সেই প্রিয়া, যাকে ভালোবেসে পাগল হয়ে ছিলাম একদিন, সে যেন আস্তে আস্তে চলে গিয়েছিল অনেক অনেক দূর। প্রিয়া, সোনা আমার! তুমি একবার ফিরে এসো আমার কাছে। দেখো – আমি কোনোদিন আর কোনোরকম কষ্ট পেতে দেবোনা তোমায়। আর একবার সুযোগ দাও আমায়, তুমি দেখো – একেবারে তোমার মনের মতো আমি হয়ে উঠতে পারি কিনা! Please প্রিয়া, তুমি ওই অভিমানী মুখটা আবার হাসিতে ভরিয়ে দিয়ে উঠে এসো আমার কাছে। বলো – তোমার কিছুই হয়নি, তুমি ভালো আছো? আমায় ক্ষমা করেছো?

উদয়ন মুখে বিড়বিড় করে নিজের সঙ্গেই কথা বলে চলে আর চোখ দিয়ে অবিরত বয়ে চলে জলের ধারা।

খবর পেয়ে উদয়নের দুই বন্ধু এসে উপস্থিত হয়েছিল। তাদের সাথে নিয়েই প্রিয়ার শেষ কাজ করেছে ক্যাওড়া তলা মহা শ্মশানে। বন্ধুরা উদয়নকে যখন বাড়ী পৌঁছে দিল – তখন রাত এগারোটা বেজে গেছে।

উদয়নের বাড়ীতে কিভাবে যেন এই দুঃসংবাদটা চলে এসেছিল। বাড়ীর অন্যান্য লোকেরা সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে গজলা করছিল। উদয়নকে আসতে দেখেই তারা নিজেদের আলোচনা থামিয়ে উদয়নের থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব কিছু জেনে – দুঃখ প্রকাশ করে যে যার ঘরে ঢুকে গেল।

বাবলু তখন মিসেস সিনহার কাছে খাওয়া দাওয়া সেরে ঘুমিয়ে পড়েছিল। উদয়ন ঘুমন্ত বাবলুকে কোলে নিয়ে নিজেদের ঘরে এসে বিছানায় শুইয়ে দিল। ঘুমের মধ্যে নড়াচড়া পেয়ে বাবলুর ঘুমটা ভেঙে গেল। ও হঠাৎ দেখলো ও ওদের ঘরের বিছানায় শুয়ে। ওর পাশে মা নেই। শুধু বাবা আছে। ও অবাক হয়ে জানতে চাইল – বাবি, মা কোথায়? মা ফেরেনি? মা কোথায় গেল?

বাবলুর এই সরল, নিষ্পাপ প্রশ্নের উত্তর উদয়ন দিতে পারলো না। বাবলুকে জড়িয়ে ধরে আর নিজেকে সামলে রাখতে পারলো না। সকাল থেকে পাওয়া মানসিক যন্ত্রণা, কষ্ট, চিন্তা, ভাবনা – এই সবকিছুই উদয়নের চোখে জলের বান ডাকলো। ও ছেলেকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে একেবারে চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করে দিল। তারপর অনেকক্ষণ পর কান্নার বেগটা একটু কমতে, বাবলুর মুখের দিকে তাকিয়ে বললো

– না বাবলু, তোমার মা আমার ওপর অভিমান করে আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। আর কোনোদিনও ফিরে আসবে না তোমার মা!

পর্ব - ৪

শোকের প্রাথমিক ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠেছে এখন উদয়। এক সপ্তাহ কেটে গেল আজ প্রিয়া নেই। প্রথম প্রথম যেন নিজের মনকেই ঠিক বিশ্বাস হতো না যে আর প্রিয়া নেই। ঘুম থেকে অভ্যাসমতো উঠেই - প্রিয়া - চা দাও বলে বাথরুমে চলে গেছে উদয়ন। তার কিছুক্ষণ পরেই মনে পড়ে যেত - কেউ আর ওকে এখন চা দিতে আসবে না। প্রিয়া নেই। আলমারিতে জামা কাপড় কিছু খুঁজে না পেলে অভ্যাসমতো - প্রিয়া, জামাটা কোথায় গেল বলোতো? সেই চেক চেক জামাটা? তার পরেই নিজের ভুল শুধরে নিয়েছে, ও হো, প্রিয়া তো আর কোনোদিনই আসবে না ওর জামা প্যান্ট খুঁজে দিতে। আর তারপরেই দুচোখ জলে ভরে উঠেছে ওর। বিছানায় বা চেয়ারে বসে পড়ে তারপর কান্নাকাটি করেই কেটে গেছে অনেকটা সময়।

এই কয়েকদিন উদয়ন আর অফিস যায়নি। ভালো লাগছে না আর কিছুই। কিসের জন্য আর অফিস যাবে ও? কার জন্যেই বা যাবে? ভাবে - বাবলুকে কোনো বোর্ডিং হাউসে পাঠিয়ে দিয়ে এই ফ্ল্যাট বিক্রী করে অনেক দূরে কোথাও চলে যাবে এই সমাজ সংসার ছেড়ে। ফ্ল্যাট বেচে দিয়ে যা টাকা পাবে - তা পুরোটাই বাবলুর জন্য রেখে দেবে উদয়ন। আর অফিস থেকে পাওনা গন্ডা বুঝে নিয়ে হিমালয়ে বা অন্য কোনো নিরুদ্দেশে চলে যাবে ও। এই ফ্ল্যাটে যেন ও আর থাকতে পারছে না। যেদিকে তাকাচ্ছে - শুধু প্রিয়াকে, প্রিয়ার হাতের ছোঁয়াকে দেখতে পাচ্ছে ও। যে বিছানায় শুয়ে ওরা নতুন সংসার শুরু করেছিল, সেখানে এখনও ও প্রিয়ার শরীরের গন্ধ পাচ্ছে। রান্না ঘরে কিছু রান্না করতে গেলে প্রিয়ার পরিপাটি করে গুছিয়ে রাখা বাসনপত্র একেবারে হাতের কাছে পেয়ে যাচ্ছে। এই সব কিছুতেই যেন প্রিয়ার ছোঁয়া লেগে আছে। আলমারির জিনিসপত্র, টেবিলের প্রত্যেকটি জিনিস, ডাইনিং টেবিলে রাখা জলের বোতল গুলো পর্যন্ত প্রিয়া পছন্দ করে কিনে বড়ো যত্নে সাজিয়ে ছিল নিজের সংসার। তাছাড়া দোকান বাজার, সংসারের সমস্ত কাজ প্রিয়া এমন ভাবে করতো যে উদয়নকে কোনোদিনও ভাবতে

হয়নি - কি ভাবে কি হচ্ছে। ও শুধু নিজের মতো চাকরী করতো আর সংসার খরচের টাকাটা প্রিয়ার হাতে তুলে দিত। আর কিছুই ভাবতে হতো না ওকে।

অনেক সময় মাসের শেষ দিকে হয়তো কোনো অনুষ্ঠানে নেমন্তন্ন যেতে হতো বা অন্য কোনো কাজ পড়ে গেল, অথচ সেই সময় হয়তো উদয়নের কাছে অতোটা টাকা থাকতো না, প্রিয়া কিভাবে যেন সব বুঝে যেত। তারপর নিজের থেকেই সেই খরচের টাকাটা বার করে দিত।

উদয়নের অনেক দিনের একটা স্বভাব, রাতের খাওয়ার পর খুব আরামকরে একটা সিগারেট ধরিয়ে বারান্দার চেয়ারটায় বসতো আর অভ্যাসমতো চেয়ারটাকে একটু হেলিয়ে দিতো। এটা কিভাবে যেন প্রিয়া লক্ষ্য করেছিল। দু - তিনমাস পরে উদয়ন বাড়ী ফেরার পর রাতের খাওয়া দাওয়া সেরে বারান্দায় গিয়ে অবাক হয়ে দেখলো যে ওখানকার চেয়ারটা আর নেই। তার বদলে আছে একটা সুন্দর ইজিচেয়ার। প্রিয়া ওর অবাক হওয়া দেখে পেছন থেকে ওকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল - তুমি এই সময়টা একটু Relax করো, দেখেছি চেয়ারটা হেলিয়ে বসতে। তাই আমি কিস্তিতে এই ইজিচেয়ারটা কিনে ফেললাম তোমার জন্যে। তুমি এবার থেকে এটাতেই বসবে এই সময়। না, না, তোমায় এর টাকা দিতে হবে না। ও আমি ঠিকই দিয়ে দেব এর ভেতর থেকে।

এই সেদিন উদয়ন ঘরে পরার পাঞ্জাবী - পাজামাটা খুঁজে পাচ্ছিল না। আগের সময় হলে একবার শুধু প্রিয়াকে বললেই হতো, সঙ্গে সঙ্গে সব কিছুই চলে আসতো হাতের নাগালে। সেদিন কোথাও সেগুলো খুঁজে না পেয়ে অবশেষে আলমারি ঘাঁটতে শুরু করে দিল। কী আশ্চর্য্য, আলমারিতে নিখুঁত ভাবে সাজানো আছে একদিকে প্যান্টের সেট, পাশে জামার সেট, একটা তাকে পরপর পাজামা, পাঞ্জাবী এবং উদয়নের সমস্ত অন্তর্বাস এবং রুমালের গোছা। অন্য দুটো তাকে অবশ্য প্রিয়ার ই সমস্ত জিনিসপত্র থরে থরে সাজানো। পর পর শাড়ী, সালোয়ার কামিজ, এবং অন্যান্য জিনিসপত্র। আলমারির একেবারে নীচের তাকটায় আছে শুধু বাবলুর জামা - প্যান্ট এবং আরো নানান কিছু!

এই ফ্ল্যাটটার চারিদিকে শুধু প্রিয়ার ই স্মৃতি ছড়ানো। যেদিকে তাকায় উদয়ন, সেদিকেই প্রিয়ার স্পর্শের, অনেক যত্নে সাজানো জিনিসপত্রের সম্ভার। বাথরুমটার ব্যাপারে একটু দুর্বলতা ছিল প্রিয়ার। সেই বাথরুম নিজের হাতে নিজের পছন্দের সমস্ত জিনিসপত্র কিনে মনের মতো করে সাজিয়ে ছিল প্রিয়া। এমনকি ওর ভেতরে একটা খুব সুন্দর ছবি আর প্লাস্টিকের গাছও এতো শিল্প সম্মত ভাবে সাজানো - যে ভাবা যায় না। উদয়ন অবাক হয়ে ভাবে - এতোদিন প্রিয়ার সঙ্গে এই ফ্ল্যাটেই তো সংসার করলাম। এই ফ্ল্যাটের প্রায় প্রত্যেকটা জিনিসপত্র এতোদিন ধরে একইভাবে রয়েছে, কিন্তু আগে তো কোনোদিন সেগুলো সেভাবে চোখে পড়েনি? এই যে এতো সুন্দর করে সবকিছু সাজানো, এসব তো ও দেখেও দেখেনি সেভাবে। আজ যেন সবকিছুই চোখে পড়ছে নতুন করে, মুগ্ধ হয়ে দেখছে সেই সৌন্দর্য্য প্রীতির দিকে! কেন এসব তখন চোখে পড়েনি ওর? কেন একটু অনুভব করেনি এই ভালোবাসার স্পর্শকে? বড়ো আফসোস হয় এখন উদয়নের । প্রিয়া হয়ত এতো সুন্দর করে, পরিশ্রম করে ঘর সাজিয়ে আশা করতো উদয়নের থেকে একটু Appreciation, একটু প্রশংসার। কিন্তু তখন কেন এরকম ভাবে দেখা হয়ে ওঠেনি ওর? প্রিয়া কি ওর থেকে চলে গিয়ে আরো গভীরভাবে ওর জীবনে প্রকাশ করলো নিজেকে? প্রিয়া কি এখন সূক্ষ্ম দেহে এই ফ্ল্যাটের চার কোণের মধ্যে অতৃপ্তি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর উদয়ণকে বলতে চাইছে -- যখন আমি তোমার খুব কাছে

ছিলাম, তখন আমাকে দেখার কোনো সময় হয়নি তোমার! এখন? এখন যতোই আমায় প্রয়োজন থাক তোমার, সারা পৃথিবী খুঁজলেও আর আমায় পাবে না তুমি।

উদয়ন এখন ভোর ভোর ঘুম থেকে উঠে আগে বাবলুর জন্যে ব্রেকফাস্ট তৈরী করে, টিফিন তৈরী করে। তারপর বাবলুকে ঘুম থেকে তুলে ওকে স্কুলে যাবার জন্যে রেডী করায়। তারপর ওকে স্কুল বাসে তুলে দিয়ে শুরু হয় একটা নতুন দিন, যে দিনের সারা সময়টা ও একা থাকে ওই ফ্ল্যাটে আর প্রিয়াকে নতুন করে রোজ একটু একটু করে আবিষ্কার করে। তারপর একটু বেলায় রান্না বসায় দুজনের মতো। বাবলুর ছুটি হবার পর বাড়ী ফিরলে ওকে চান করিয়ে - দুজনে মিলে খেতে বসে। তারপর উঠে বাবলুর সঙ্গে গল্প করতে বসে, খেলে, তারপর বিকেলে বাবলুকে নিয়ে পাশের পার্কটায় যায়। বাবলু পার্কে খেলে, স্লীপে চাপে, দোলনায় চাপে, আর ঢেঁকিতে চাপলে উদয়নকেও কাছে ডেকে নেয়। বাবলু একদিকে বসে আর অন্যদিকে উদয়ন হাত দিয়ে চাপ দেয়। বেশ লাগে এসব উদয়নের। ও ভাবে, অন্ততঃ মাঝে মাঝে তো খুব সহজেই বাবলুকে নিয়ে প্রিয়ার সাথে আসা-ই যেত এখানে। প্রিয়া তো পার্কে এলে একেবারে ছেলেমানুষের মতো হয়ে যেত। ইস্, কি মিস্ করেছি এসব! কেন আসেনি ও আগে এখানে প্রিয়া আর বাবলুর সাথে? খুব ভুল হয়ে গেছে, ইস্! আর তো কিছুতেই ফিরে পাওয়া যাবে না সেই সোনালি দিনগুলো! উদয়নের চোখে জল চলে আসে। হতাশার জল, হেরে যাওয়ার জল!

আজ উদয়ন ভেবে রেখেছে দুপুরে ওই আলমারি থেকে সব কিছু নামিয়ে দেখবে ভালো করে। দেখবে প্রিয়ার ওই অতো শাড়ী, জামা ইত্যাদি কোনো দুঃস্থ মহিলাদের সংস্থায় দান করে দেওয়া যায় কি না! এইসব জিনিসপত্রের একটা বিলির ব্যবস্থা করে দিয়ে পরের session এ বাবলুকে কোনো ভালো বোর্ডিং স্কুলে ভর্তি করে হিমালয়ে চলে যাবে। এভাবে, এই অসহ্য কষ্টের মধ্যে কিছুতেই আর থাকা যাচ্ছে না।

এই চলে যাবার চিন্তা মাথায় এলেই আরেকটা চিন্তাও মাথায় সঙ্গে সঙ্গেই চলে আসে। বাবলু তো মা হারা হয়েইছে। এখন যদি উদয়ন নিজেও ওকে বোর্ডিং এ পাঠিয়ে নিজে বিবাগী হয়ে চলে যায়, সেটা কি উচিৎ হবে? ওর ওপর কি উদয়নের কোনো দায়িত্ব নেই? শুধু টাকা পয়সার ব্যাবস্থা করে দিলেই কি সব দায়িত্ব সারা হয়ে যায়? - কি জানি, উদয়ন এই অবধি এসেই আর কিরকম যেন খেই হারিয়ে ফেলে। বুকের ভেতরটা কিরকম যেন চিনচিন করে ওঠে!

আলমারি খুলে প্রিয়ার শাড়ী, জামা সব কিছু নামাতেই পাওয়া গেল একটা ব্যাংকের পাশ বই। রেকারিং ডিপোজিটের পাশ বই। Account holder Minor, বাবলুর নামে। অভিভাবক হিসেবে Account holder প্রিয়া। প্রতিমাসে সংসার খরচ বাঁচিয়ে পাঁচশো টাকা করে জমা পড়েছে প্রায় দু - বছর। পাঁচ বছরের জন্য করা। কি জানি , প্রিয়া কি স্বপ্ন দেখে এই রেকারিং ডিপোজিট খুলেছিল বাবলুর জন্যে। ওতে নমিনির নাম উদয়নের। মনটা বেশ খারাপ হয়ে গেল উদয়নের। সংসারের খরচ খরচা নিয়ে উদয়ন তো কতোবারই বলেছে প্রিয়াকে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, ওই টুকু টাকার ভেতরে সব কিছু খরচ করেও এই রেকারিং ডিপোজিট করেছিল প্রিয়া। ও উদয়নকে এই একাউন্টের ব্যাপারে কোনোদিন কিছু বলেনি - একটাই কারণে। উদয়নের যদি জানা থাকতো ব্যাপারটা, খুব টাকার টানাটানির সময় ও হয়তো এই একাউন্ট টা close করে দিতে বলতো। কিছুতেই রাখতে দিতো না আর সেটা।

আরো কিছু জিনিসপত্র নামানোর পর বেরুলো একটা ছোটো গয়না রাখার বাক্স । উদয়ন সাবধানে খুলে ফেললো বাক্সটা। ওর মধ্যে কিছু টাকা রাখা আছে। উদয়ন গুণে দেখলো পুরো দুহাজার তিনশো বাষট্টি টাকা। ওহ্, এইটাই তাহলে প্রিয়ার emergency ফান্ড? বিপদে আপদে, প্রয়োজনে এখান থেকেই টাকা বার করে দিতো ও উদয়নকে? ও কতো সঞ্চয়ী ছিল - নতুন করে সেটা বুঝতে পেরে উদয়নের বুকটা একেবারে হূ হূ করে উঠলো।

ওই বাক্স থেকে তারপর বেরুলো একটা সোনা বাঁধানো পলার চুড়ি, যার ওপরে সোনার পাতটা বেশ কিছুটা ভাঙ্গা। বিদ্যুৎ গতিতে উদয়নের মনে পড়ে এইটা উদয়নের মার হাতের চুড়ি। বিয়ের সময়ে মা প্রিয়াকে সেটা নিজে হাতে পরিয়ে দিয়েছিল। এই সোনার পাতটা কিভাবে যেন একটু ভেঙ্গে গিয়েছিল। প্রিয়া তখন একবার সেটা উদয়ন কে বলেছিল - দেখো মায়ের হাতের চুড়ি। চুড়িটার সোনার পাতটা বেশ কিছুটা ভেঙ্গে গেছে। ওটা একটু সারিয়ে দেবে? উদয়ন তখন ওকে বলেছিল - ঠিক আছে সামনের মাসে মাইনে পেয়ে ওটা সারিয়ে দেবো। কিন্তু তারপর উদয়নের আর সেটা মনে পড়েনি কোনোদিন, প্রিয়াও আর কোনোদিন মনে করিয়ে দেয়নি সেটা। কেন দেয়নি? ও কি ভেবেছিল যে উদয়ন মনে রেখে ওটা ঠিক করিয়ে দেবে নিজের থেকে? না - কি ভেবেছিল - ওসব সোনা তো আর পরাই হয়না। তাই শুধু শুধু ওসবে টাকা খরচ করে আর কি হবে! সংসারের প্রতি মাসেই এতো খরচ খরচা, এর মাঝে আবার এসব ব্যাপারে খরচ বাড়িয়ে কি হবে?

উদয়ন এবার চিৎকার করে ওঠে নিজের মনেই। প্রিয়া, কেন তুমি একবারও মনে করিয়ে দাওনি বলোতো এই চুড়িটা সারিয়ে দিতে? কেন? তুমি তো তাহলে একটু পরতে পারতে? অন্ততঃ মাঝে লোকজনদের বাড়ী বা বিয়ে বাড়ীতে যখন যেতে - তখনও তো একটু পরে যেতে পারতে! দেখো - তুমি যে একেবারে খালি হাতেই এসব অনুষ্ঠান বাড়ী যেতে, আমি দেখেছি, কিন্তু লক্ষ্য করিনি সেভাবে। এখন সব পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি আমি। কেন তখন আমার একবারও মনে হয়নি প্রিয়া? কেন তোমার দিকে সেভাবে তাকাইনি আমি তখন? কেন? এটা ঠিক, তুমি কোনোদিন কোনো ব্যাপারে দাবী করোনি সেভাবে। কিন্তু আমি তো একটু লক্ষ্য করতে পারতাম বলো? করা উচিত ছিল তো আমার! কেন করিনি বলোতো? তোমায় বিয়ে করার পর তুমি কি আমার জীবনে একটা অভ্যাস হয়ে উঠেছিলে? তোমায় কি আসলে আমি একজন নন্ এনটিটি হিসেবে দেখতাম? এই ফ্ল্যাটে রাখা খাট, বিছানা, আলমারির মতো - তুমিও কি শুধু একটা অবশ্যম্ভাবী অংশ হয়ে উঠেছিলে আমার জীবনে? যাকে আলাদা করে দেখার নেই, যাকে নিয়ে আলাদা করে কিছু ভাবার নেই, চিন্তা করার নেই? কেন তুমি তোমার existance টা আমায় মনে করে দাওনি প্রিয়া? কেন? এই চলে যাওয়া দিনগুলো আমি আর কিভাবে ফেরাব বলো তো? তুমি তোমার কথা কোনোদিনও আমায় বলোনি কেন প্রিয়া? আমি দেখতে চাইনি বলে - তুমি তোমার চাওয়া পাওয়ার কথা, ইচ্ছে - অনিচ্ছের কথা কেন কোনোদিন বলোনি বলোতো? এখন তো আমি সারাজীবন মরমে মরে যাবো। বাকী জীবনটা শুধু অনুশোচনায় ভুগবো। কেন এমন শাস্তি দিলে বলোতো আমায়?

তুমি একবার তোমার একটা ইচ্ছের কথা জানিয়েছিলে আমায়। বিয়ের পরে আমায় বলেছিলে একবার পুরী নিয়ে যেতে। মনে আছে প্রিয়া, আমি নানান টাল বাহানা করে কাটিয়ে দিয়েছিলাম সেসব। বলেছিলাম - একটু সামলে নিই, তারপর যাবো। তারপর থেকে অনেকবারই সেই কথা আমার মনে পড়েছে, কিন্তু অদ্ভুত ভাবে দেখেছি - তুমি আর কোনদিনও আমায় - শুধু পুরী কেন, আর কোথাও বেড়াতে নিয়ে যাবার কথা বলোনি আমায়। আমি যে কোনোদিনও যেতাম না - তা নয়। আসলে যাবো যাবো করে আর যাওয়া হয়ে ওঠেনি। এখন কি করবো প্রিয়া, তুমি তো আমায় আর কোনো সময় না দিয়েই চলে গেলে। ভীষণ, ভীষণ আফশোষ হচ্ছে প্রিয়া এখন আমার। কেন যাইনি বলো তো? কেন তোমার সেই একটা বেড়াতে যাবার

অনুরোধ- ও আমি রাখতে পারিনি? আমি কি তখন মূর্খের মতো ভেবেছিলাম - আমাদের জীবন অনন্তকাল অবধি চলবে? পরে কোনোদিন একবার ঘুরিয়ে দিলেই হবে? কিন্তু তুমি যে কোনোদিন হটাৎ আমায় ছেড়ে চলে যেতে পারো, এত কেন আমি কোনোদিনও আগে ভাবতে পারিনি বলোতো? তুমি যদি পূর্ণ জীবন উপভোগ করে, নিজের সমস্ত চাওয়া পাওয়া মিটিয়ে নিয়ে আমায় ছেড়ে চলে যেতে, তাহলেও আমি দুঃখ পেতাম, এটা ঠিক, কিন্তু আজকের মতো এতো অপরাধবোধে ভুগতে হতো না আমায়। প্রিয়া, তুমি আমায় চির অপরাধী করে রেখে চলে গেলে। এই অপরাধবোধ নিয়ে আমায় ভুগতে হবে আমার জীবনের শেষ দিন অবধি। এটা কেন করলে প্রিয়া? কেন?

বেশ কিছুক্ষণ উদাস হয়ে বসে থাকে উদয়ন। বারান্দায় চোখ পড়ে গেল। একটা চড়ুই পাখির ঝাঁক বারান্দায় বসে কিচির মিচির করে চলেছে, তারা আবার ইজিচেয়ারটায় বসেও কিচির মিচির শুরু করে দিল ।

অনেকক্ষণ পর ধীরে ধীরে ওঠে উদয়ন। আলমারির বাকী জিনিসপত্র নামানোর সাথে সাথে পাওয়া গেল একটা মাঝারি সাইজের কালো ডায়েরী। খুব অবাক হয়ে উদয়ন ভাবতে থাকে - প্রিয়া ডায়েরি লিখতো নাকি? কোনোদিন তো ওকে ওই ডায়েরীতে কিছু লিখতে বা পড়তে দেখেনি ও! সত্যি কথা বলতে কি কোনোদিনই আগে ওই ডায়েরীটা দেখেওনি উদয়ন। কৌতূহল বশতঃ ডায়েরীর পাতা উল্টে দেখতে গিয়ে কিরকম যেন অস্বস্তি হলো উদয়নের। এভাবে কি কারোর ডায়েরী পড়া যায়? না পড়া উচিত? প্রিয়া যতোদিন ছিল কোনোদিন এই ডায়েরীটা দেখায়নি বলেই এখন কি সেটা পড়ে দেখা উচিত? না, না, এটা ঠিক হবে না। প্রিয়ার আত্মা শান্তি পাবে না এতে! থাক ওটা যেমন আছে। খুলে দেখার দরকার নেই।

কিন্তু বিধি বাম। অন্য একটা বাক্স সরাতে গিয়ে ডায়েরীটা মেঝেতে উল্টে পাল্টে পড়ে গেল এমনভাবে, যে তার একটা পৃষ্ঠা একেবারে চোখের সামনে চলে এলো। উদয়ন অবাক হয়ে দেখলো - সেখানে অন্য কিছু লেখা নেই, আছে শুধু কবিতা লেখা। আর হ্যাঁ, ওখানকার হাতের লেখাটা প্রিয়ারই হাতের লেখা!

আশ্চর্য্য! প্রিয়া কবিতা লিখতো নাকি? ঘুণাক্ষরেও তো সেটা জানতে পারিনি কোনোদিন! এতোটা সময় একসাথে কাটালাম আমরা, তবু চেনাই হয়নি তো মানুষটাকে। কি অদ্ভুত ব্যাপার। একসময় যাকে মনে হতো - শুধু আমারই, যার সবকিছুই আমার জানা, চেনা। কিন্তু কবিতা লেখার মতো একটা এতো বড়ো গুন যে প্রিয়ার আছে - সেটা তো কোনোদিনই জানা যায়নি। আচ্ছা, প্রিয়াকে কি আমি সত্যি সত্যি চিনতাম কোনোদিন? পাশের মানুষটাই যে সবচেয়ে বেশী অচেনা রয়ে গেল!

সন্তর্পনে খাতাটা খুলে ধরলো উদয়ন। পাতায় পাতায় কবিতা লেখা। কোনোটা শুধুই ভালোবাসার, কোনোটা আবার কোনো সুখ - স্বপ্নের, আবার কোনোটায় শুধুই হতাশা, অভিমানের। একটা কবিতায় চোখ আটকে গেল উদয়নের। ও পড়তে থাকলো -

আমি জানি - তুমি তখন আসবে আমার কাছে।

তোমার হাতে হয়ত একটা সাদা ফুলের মালাও থাকবে তখন!

জলভরা চোখে হয়ত বলবে - চলে গেলে?

আমার মুখের কথাই সত্যি ধরে নিয়ে -

তুমি চলে গেলে?

হয়ত আমার সব রাত জাগা সৃষ্টিগুলো -

দেখার সময় হবে তখন তোমার,

হয়ত বুঝবে - ওগুলো কাল্পনিক কাব্য ছিলনা কখনই,

ছিল অনেক না বলা আভাস।

ছিল অনেক যন্ত্রণা, ভালোবাসা এবং -

ভালোবাসাহীনতার বিজ্ঞাপন,

হৃদয় খুঁড়ে তুলে আনা কিছু সজীব উপহার।

তখন তোমার ভালোবাসতে ইচ্ছে হবে আমায়।

বুকের ওমে ভরিয়ে দিতে চাইবে আমায় তখন,

আমি চোখ বুজে সব কিছু দেখবো -

আর অস্ফুটে বলবো তখন - বড়ো দেরী হয়ে গেছে তোমার -

হৃদয় পুরের বাতাস নিতে।

বড়ো দেরী হয়ে গেছে তোমার তখন!

আমি যাই, আর ডেকোনা আমায়।।

বুকের ভেতরে যে একটা চিনচিনে ব্যথা এতক্ষণ উদয়নকে বারবার কষ্ট দিচ্ছিল, সেটা এখন বাইরে এসে তুমুল বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়তে লাগলো উদয়নের চোখ দিয়ে। ডায়েরীটা বুকের মধ্যে চেপে ধরে হাহাকার করে, চিৎকার করে কাঁদতে লাগলো উদয়ন।।